প্রভু জগন্নাথ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকাল : শুভ রথযাত্রা, ১৩ আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীজয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

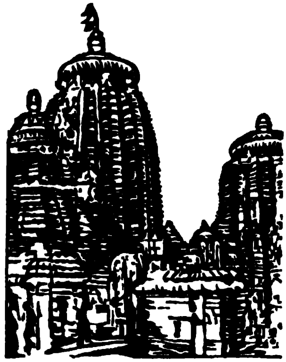
মুদ্রাকর : শ্রীকুশধ্বজ মান্না, মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

স্বামী ধর্মরূপানন্দজী
শ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

সুখ দাও ভগবান
অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর
ঝড়
দিদি
নিযতি
বেশ আছি বসে বশে
যা হয, তাই হয
মামা এক মামা দুই মামা তিন চাব
আরোহী
কালের কাণ্ডারী
গিরিশচন্দ্রের শ্রীবামকৃষ্ণ
শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র
শ্রীচরণকমলে
মুখোমুখি শ্রীরামকৃষ্ণ
দাদুর কীর্তি
গাঙচিল
কিচির মিচির
সাপে আর নেউলে
রাত বারোটা
কাটলেট
কিশোর রচনাসম্ভাব ১ম, ২য, ৩য
হেডস্যারের কাণ্ড
বড়মামার কীর্তি
থ্রি-এক্স
বাঘমারি
সপ্তকাণ্ড
সাত টাকা বাবো আনা
হাসি কান্না চুনী পান্না
পুরনো সেই দিনের কথা
গাধা
সুখ ১ম, ২য়, ৩য়
আন্দামান : ভারতের শেষ ভূখণ্ড
বাঙালিবাবু
উৎপাতের ধন চিৎপাতে
হাসির আড়ালে
নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
১৩টি উপন্যাস (একত্রে)

প্রভু জগন্নাথ



প্রভু জগন্নাথ

ভারতবর্ষে যত দেবতা আছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জটিল হলেন, শ্রীক্ষেত্রের পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথ। প্রাত্যহিক পূজার এই মন্ত্রটি অনুধাবন কবলেই বোঝা যাবে,

যং দারুব্রহ্মা মূর্তিং প্রণবতনুধরং
সর্ববেদান্ত সারং
ভক্তানাং কল্পবৃক্ষ ভবজলতরণী
সর্বতখানুখম।
যোগীনাং হংসতত্ত্বং হরিহর নমিত
শ্রীপতি বৈষ্ণবানাং
শৈবানাং ভৈরবাস্যাং পশুপতি পরমং
শাক্ততন্ত্রে শবিতং চ।
বৌদ্ধানাং বৌদ্ধসাক্ষাৎ রূপ ভয়তি বরো
জৈন সিদ্ধান্তমূর্তিঃ।
তাং দেবো পাতু নিত্যং কলি কলুষহরং
নীল শিলাধিনাথঃ।।

নিমকাঠের বিশাল এক মূর্তি। অসম্পূর্ণ, অসংস্কৃত। কেন এমন? এ-প্রশ্নের অনেক উত্তর। ইতিহাসের অনেক পাতা উলটে যেতে হবে। গবেষকদের গবেষণার ইতি নেই। জমাট এক রহস্য পুরীর সমুদ্রতীরে 'নীল শিলাধিনাথ'। বিস্ফারিত দুই চোখ যেন এই পৃথিবীর দুই গোলার্ধ। ভীতিপ্রদরকমের সুন্দর। দৃষ্টিতে কঠোর রসিকতা। ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ধাবমান স্রোতকে ঘুরপাক খাইয়ে স্বরাট বসে আছেন। ঐশ্বর্যের রত্নবেদিতে স্বতন্ত্র এক ধর্ম-সংস্কৃতি তৈরি করে। অবিরত ঢেউভাঙা সমুদ্রও তুচ্ছ হয়ে গেছে ওই মৌন মহেশ্বরের কাছে। কোনো দেবতার গহনে এত বিস্ময় নেই। এক খণ্ড

কাঠের এ কি ভেল্কি! দারু দেবতার কি মহিমা! ধর্মীয় হানাহানির আকাশে মাথা তুললেন এই বৃক্ষদেবতা। অসম্পূর্ণ আকৃতিতে সমন্বিত হল সমস্ত ধর্মমত। উদ্ভাসিত হল নব দিগন্ত। শুধু ধর্ম নয় তৈরি হল জগন্নাথ সংস্কৃতি। বঙ্গের শ্রীচৈতন্য প্রবল তরঙ্গের মতো প্রবাহিত হয়ে গেলেন পুরুষোত্তম সাগরে। অবিশ্বাস্য আকৃতিতে, 'জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'। কে এই দেবতা? অনবদ্য কাব্যে মহাপ্রভু তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করলেন,

'মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীল শিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকল সুরসেবাবসরদে
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

মহাসাগরের তীরে, সুবর্ণাভনীলাচলশিখরে, প্রাসাদমধ্যে সুভদ্রাকে মধ্যভাগে স্থাপন করে সহোদর ধরে বলভদ্রের সঙ্গে বাস করে সকল দেবতাকে সেবার অবসর দান করেন।

সে এক ভীষণ সময়, বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। গেল গেল অবস্থা। আর্যরা অনার্যদের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবেশ করতে পারছেন না। আর্য আর অনার্য সংস্কৃতির বিপরীত মেরুতে অবস্থান। এই অবস্থায় হাত মেলাবার প্রয়োজন হয়েছিল। একটা সঙ্কর সংস্কৃতির জন্ম হল। বিবর্তিত হিন্দু ধর্মে আর্যবিশ্বাস আছে কি নেই। অনার্য আর দ্রাবিড় বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত হল হিন্দু ধর্ম। শঙ্করাচার্য প্রতিহত করলেন বৌদ্ধধর্ম। রূপান্তরিত হিন্দুধর্মে গজিয়ে উঠল বিভিন্ন সম্প্রদায়। শুরু হল সাম্প্রদায়িক মারদাঙ্গা। শঙ্করপন্থীও রামানুজ পন্থীদের রক্তারক্তি দ্বন্দ্ব।

ইতিহাসের এই অন্তমূহূর্তে অরণ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন দারুদেবতা। বনের মানুষ শবররা এই দেবতার উপাসক। রূপহীন রূপে তিনি তাক লাগিয়ে দেবেন। ধর্মীয় অসভ্যতায় তিনি তৈরি করে দেবেন এমন এক উত্তম ধর্ম-সংস্কৃতি যেখানে আশ্রয় পাবে শুধু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম নয়, হিন্দুধর্মের অন্যসব শাখার বিশ্বাস। এই দেহে হবে লীন। এই দেবতার পূজার মন্ত্রে সমস্ত ধর্মের ছায়া। সময়ের বিগ্রহ প্রভু জগন্নাথ

কে এমন করলেন? কোন ধর্মগুরু?

তিনিই করলেন। স্বপ্রকাশ। মানুষের সাধ্য ছিল না। আদিতে তিনি শবরদের দেবতা। অনেক কাহিনীর একটি হল প্রাচীন উড়িষ্যার পশ্চিম ভাগে, অর্থাৎ দক্ষিণ কোশল, বর্তমানের মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরের একটি গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন এক প্রবীণ শবর। তিনি দারুদেবতার উপাসনা করতেন। সেই দেবতার অলৌকিক ক্ষমতার কথা সবাই জানতেন। বৃদ্ধ শবর তাঁর উপাস্য দেবতাকে অরণ্যের এক নিভৃত স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই সন্ধান অন্যের জানার উপায় ছিল না। সেই সময়

উড়িষ্যার রাজা পুরীতে বিশাল এক মন্দির নির্মাণ করলেন। রাজার ইচ্ছা মন্দিরে ওই অলৌকিক দেবতাকেই প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি এক ব্রাহ্মণকে পাঠালেন ওই গ্রামে। রাজপ্রতিনিধি বৃদ্ধ শবরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে দেবতাকে একবার দর্শনের জন্যে আবদার ধরলেন। বৃদ্ধ কোনোমতেই রাজি হলেন না। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে শবর কন্যার প্রেম হল। ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে বিবাহ করতে চাইলেন। কন্যার আগ্রহে শবরকে রাজি হতে হল। ব্রাহ্মণ হলেন জামাতা। আবার ফিরে এল দারুদেবতাকে দর্শনের বায়না। শবর দুহিতা পিতাকে রাজি করালেন। শবর বললেন, জামাতার চোখ বেঁধে দেবস্থানে নিয়ে যাব। পথের হদিস যেন না পায়।

নারীর বুদ্ধি। স্বামীর উত্তরীয়ে বেঁধে দিলেন প্রচুর সরষে-বীজ। ব্রাহ্মণ চোখ বাঁধা অবস্থায় শ্বশুরের সঙ্গে চলেছেন অরণ্যপথে। একটু একটু করে সরষে বীজ ছড়াতে ছড়াতে। এইবার অপেক্ষা। বীজ থেকে বেরবে সরষে গাছ। হলুদ হলুদ ফুল।

এইবার সেই আধ্যাত্মিক প্রতারণা। ব্রাহ্মণ তাঁর জামাতার ভূমিকা ছেড়ে হয়ে গেলেন রাজপ্রতিনিধি। সরষের ফুলের নিশানায় পথ চিনে একাকী ব্রাহ্মণ একদিন পৌঁছে গেলেন দেবস্থানে। ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় দেবতা পুরী যেতে রাজি হলেন, বললেন, একটি কাষ্ঠখণ্ডরূপে মহানদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে পুরীতে পৌঁছব। বৃদ্ধ শবর এই সংবাদে দুঃখে ভেঙে পড়লেন। কাঁদছেন। আকাশবাণী হল, 'শোনো শবর, বহুদিন তোমার সেবা নিয়েছি, কাঁচা কাঁচা খাদ্যদ্রব্যে আর আমার রুচি নেই। এইবার আমি পাক করা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে চাই। পুরীর রাজ-আমন্ত্রণ এসেছে। এইবার বনবাসী হবে রাজমন্দিরবাসী। দুঃখ করো না, তোমার সঙ্গে আমার নাম চিরকাল যুক্ত থাকবে। এই গ্রামটির নাম হবে, সেওড়ি-নারায়ণ।'

শবর শব্দের অপভ্রংশ হল সেওড়ি। শবরের কাছে দারু-দেবতার পরিচয় ছিল সূর্যদেব—সূর্য-নারায়ণ। আদিবাসী লোকগাথা, রূপকথা প্রভৃতি আলোচনা করে গবেষকদের সিদ্ধান্ত, 'জগন্নাথ বিগ্রহের আদি বাসস্থান পুরী নয়, দক্ষিণ কোশল, বর্তমানে যা মধ্যপ্রদেশ।' হিসলপ লিখছেন, 'জগন্নাথ মূর্তি দেখে আমার মনে হয়েছে, এই মূর্তি যেন গঞ্জাম জেলার পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। এই মূর্তির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে ওই অঞ্চলের বিকলাঙ্গ কিট্টুং মূর্তির।'

পণ্ডিতপ্রবর সুশীল মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য গবেষণা-গ্রন্থ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি, 'ঈশ্বরের শাওড়া (শবর) প্রতিশব্দ সোনুমন। নামের পেছনে বোজম বা বৈ থাকলে সেটিহবে স্ত্রীলিঙ্গবাচক। ভিন্ন ভিন্ন নামে এই সোনুমনজিরা পরিচিত। এদের মধ্যে রয়েছে কিছু সংখ্যক আকাশ দেবতা, কিছু গ্রাম্যদেবতা এবং মানুষকে দুঃখকষ্ট দায়ী অমঙ্গলকামী কিছু দেবতা। এদের বিশ্বাসে কিটুংসুম বা কিট্টুংও ঈশ্বর, যদিও সকল কিট্টুংই পূজা পাবার অধিকারী নয়। অন্য দেবতাদের অপেক্ষা কিট্টুংদের মনুষ্যভাবাপন্ন মনে করা হয়।'

রূপ আর অরূপ মিলিয়ে জগন্নাথদেব প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী এক কিটুং। আমাদের বিষয় অন্য। আমাদের বিষয় জগন্নাথদেবের আহার। অরণ্যবাসীর কাঁচা নৈবেদ্যে তাঁর অনীহা। তিনি সভ্যতার দিকে এগোচ্ছেন অথবা সভ্যতা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সংঘর্ষই সভ্যতার ধর্ম। মত আর পথের লড়াই। অনাড়ম্বর বিশ্বাসের নিভৃত উপাসনার দিন শেষ। রাজা গগনচুম্বী মন্দির করলেন, বিরাট এক বিগ্রহ গঠন করালেন না কেন? কারণ ওটি করানো যায় না। রত্নদেবি পর্যন্ত এগনো যায়, তারপর অসহায়। মূর্তি গড়া যায়। কপি। দেবতার জন্ম দেওয়া যায় না। দেবতার আবির্ভাব হয়। দেবতার সঙ্গে আসেন শাস্ত্র। সময় বসে থাকে কোল পেতে।

ইতিহাসের অন্ধকারে এই দারুলীলা। শ্রীক্ষেত্রে তিনি যখন তাঁর বিপুল আয়তন নিয়ে উঠে বসলেন, সবাই হাঁ হয়ে গেলেন। নিরাকারের উপাসকরা বললেন, 'হাঁ, মিল গয়া।' এই ত নিরাকারের আকার। পুজার মন্ত্রের প্রথমেই থাক আমাদের এই চরণ—'যং দারুব্রহ্মমূর্তিং প্রণবতনুধরং সর্ব বেদান্তসারং।' আমরা শূন্যবাদী, অস্তিত্বহীন অখিল মায়ায় আমরা আছি অথবা নেই। মৃত্যুর নূপুরে জীবনের নৃত্য। এই ত আমাদের অনস্তিত্বের রূপ। পূজার মন্ত্রে আমাদের এই চরণটি থাক, বৌদ্ধানাং বৌদ্ধসাক্ষাৎ। অনৈশ্বর্যের ঐশ্বর্য আমরা পেয়েছি। যে সাজে সাজাই সেই সাজেই পাই, নইলে বৃক্ষকাণ্ড। আমাদের এই চরণটি যুক্ত হোক, জৈন সিদ্ধান্তমূর্তিঃ। আমরা ভক্ত, আমরা যে লীলা চাই, এই ত আমাদের সেই অর্চাবতার, প্রেমঘন পুরুষোত্তম! আমাদের এই নিবেদনটি থাক, ভক্তানাং কল্পবৃক্ষ ভবজলতরণী। আমরা শৈব তান্ত্রিক, এই যে সমুদ্রের তীরে বসে আছেন আমাদের ভৈরব, পূজার মন্ত্রে জুড়ে দিন আমাদের পূজার মন্ত্র, শৈবানাং ভৈরবাস্যাং পশুপতি পরমং। যোগীরা পেলেন হংসতত্ত্ব, হরি হর আর বৈষ্ণবের শ্রীপতি।

তবু যে সহজ হল না প্রভুটিকে চেনা। চিনতেই যদি না পারা গেল, পূজাপদ্ধতি, ভোগবিধি ঠিক হবে কী করে। ওডিশার বৈষ্ণব ও কবিদের ধারণায় জগন্নাথ হলেন শূন্য পুরুষ। দীর্ঘদিন ওড়িশা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ছিল। এই ধর্ম একসময় দুটি প্রধান ভাগে ভাঙল। ওড়িশায় মহাযানী মতবাদ প্রাধান্য বিস্তার করল। মহাযানীরা বললেন, জগন্নাথই বুদ্ধ—আদি বুদ্ধ। শূন্যপুরুষ জগন্নাথ। শূন্য থেকেই সৃষ্টি, অতএব সব অবতারের স্রষ্টা তিনি। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণকে জুড়ে দিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশাবতার। অন্য কোনো দেবতা জগন্নাথদেবের মতো বিবর্তিত হননি। প্রভুর যেমন ইচ্ছা। রাষ্ট্রদেবতা হলে যা হয়। শাস্ত্র নয় শাসক নিয়ন্ত্রিত। প্রথমে শবরদের দেবতা। তারপর চতুর্ভুজ নীলমাধব। তারপর হলেন জৈনদের। ক্রমে বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণবদের উপাস্য। শাসকশক্তির যেমন, যেমন ধর্মবিশ্বাস, জগন্নাথ দেবেরও সেই অনুসারে রূপান্তর। কখনো তিনি ঋষভনাথ, কখনো আদিবুদ্ধ, কখনো ভৈরব, কখনো দক্ষিণা কালিকা, সব শেষে বিষ্ণু-কৃষ্ণ। এক দেবতা থেকে যেই অন্য

দেবরূপে অর্চিত হচ্ছেন তখনই পূর্ব পূজার কিছু ছাপ এসে যাচ্ছে পূজাপদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবেই। সেই কারণেই জগন্নাথদেবের পূজাপদ্ধতিতে সমস্ত ধর্মের ধর্মবিশ্বাসের মিলন ঘটেছে। কেউ এমন দাবি করতে পারবেন না, যে মহাপ্রভু শুধু আমাদের সম্প্রদায়ের দেবতা।

ওড়িশা জগন্নাথ ক্ষেত্র। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পটমণ্ডল। রাজ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি শাসন তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। ধর্মানুসরণে, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কোনো সম্প্রদায়ই তা পারেননি। জগন্নাথের ছায়া থেকে কে বেরবে! অরণ্য গভীর। স্বয়ং মহীরুহ। মহী-শব্দের আশ্রয়ে এই পৃথিবী। মহীতল-ভূতল, মহীধ্র-পর্বত, মহীনাথ-নৃপতি। অরণ্যেই উদ্গীত আরণ্যক বেদান্তের বেদ-অন্ত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

একটি শঙ্খ যেন সমুদ্রোত্থিত। মস্তকে পশ্চিমসীমা, সেখানে বসে আছেন নীলকণ্ঠ শিব। শঙ্খের উদর সমুদ্রের জলে। শ্বেতশুভ্র শঙ্খটি মাথা তুলে এক ক্রোশ মাত্র এগিয়েছে। 'শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠ স্যাদেৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ।' এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম পাবন। সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বতশোভিতম। উৎকল খণ্ডে ঋষি জৈমিনি এই কথাই বলছেন। এই ক্ষেত্রের বিস্তার পাঁচ ক্রোশ। এর মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্র তটবর্তী দু ক্রোশ অতি পবিত্র।

শ্রীভগবান উবাচ, 'সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হতে দক্ষিণ সমুদ্রের তটভূমি পর্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্বত বিরাজমান, পৃথিবীতে সেই স্থানটি গোপনীয়, এমন কি ব্রহ্মারও অতি দুর্লভ।

কেন দুর্লভ? ইতিহাসে হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলবে। একথা ঠিক পুরীর মতো সমুদ্র সৈকত দ্বিতীয় আর নেই। 'গোল্ডেন বিচ', সুবর্ণ সৈকত। সৈকত থেকে শ্রীমন্দির সামান্য দূরত্ব। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের বিপুল বৈভবের পশ্চাতে যে-সব নৃপতির প্রয়াস রয়েছে তাঁদের নাম, (১) চুড়ঙ্গদেব, (২) বিড়গঙ্গ, (৩) একজটা কামদেব, (৪) মদন মহাদেব, (৫) রাজরাজেশ্বর দেব, (৬) ছোট পুরুষোত্তম দেব, (৭) অনঙ্গ ভীমদেব, (৮) লাঙ্গুলা নরসিংহদেব, (৯) কবি নরসিংহ, (১০) মাতা বিরজাদেই, (১১) দ্বিতীয় ভানুদেব, (১২) দ্বিতীয় প্রতিভানু, (১৩) বীর বাসুদেব, (১৪) কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-৭০ খৃঃ), (১৫) শ্রী পুরুষোত্তমদেব (১৪৭০-৯৭), (১৬) শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৪১)।

অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গদেব বা চুড়ঙ্গদেব ঘোষণা করলেন ওড়িশার রাজাধিরাজ মহাপ্রভু জগন্নাথদেব, আমি মহাপ্রভুর সামন্তরাজা, রাউত। রাজাধিরাজ জগন্নাথদেবের মন্দিরের রূপ হল, যেন সুবিশাল একটি দুর্গ। একাধিক প্রাকার ও বাধা অতিক্রম করতে পারলে তবেই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে। ১০.৭ একর জমির ওপর এই মন্দির।

দুটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা। প্রথমটির নাম মেঘনাদ বেড়া, দ্বিতীয়টির নাম কূর্মবেড়া। চারটি প্রবেশ পথ। সিংহ দুয়ার, সিংহ শৌর্যের প্রতীক। অশ্বদুয়ার, অশ্ব সামরিক শক্তির প্রতীক। ব্যাঘ্র দুয়ার, ব্যাঘ্র তেজের প্রতীক। হস্তী, দুয়ার, হস্তী সম্পদের প্রতীক। আর অপর ব্যাখ্যা হল, সিংহ ধর্ম, হস্তী অর্থ, অশ্ব কর্ম, ব্যাঘ্র মোক্ষ।

জগন্নাথ দেবের দুর্গে সর্বত্র রহস্য। প্রতি পদক্ষেপে রহস্য। সিংহদ্বারের দুধারে দেবমণ্ডল। এটি অতিক্রম করলেই সামনে বাইশটি সোপান। দেশের ভাষায় 'বাইশ পহছা'। শুরু হল রহস্যমণ্ডল। এই বাইশটি সিঁড়ি হল যোগদর্শনের বাইশটি তত্ত্ব। ধাপে ধাপে সাজানো, পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ইত্যাদি। জৈনরা বলেন, এই বাইশটি সিঁড়ি হল তাঁদের বাইশজন তীর্থঙ্কর। এঁদের স্পর্শ নিতে নিতে পৌঁছতে হবে আদি দেব ঋষভনাথের কাছে। আবার এমন যুক্তিও আছে, জগন্নাথদেব গোলোকবাসী। তলায় পড়ে আছে অষ্ট বৈকুণ্ঠ, তার তলায় চতুর্দশ ভুবন। হিরণ্যগর্ভ পদ্মাসনে প্রভুর আসন। তাঁর বেদির কাছে যেতে হবে এই চতুর্দশ ভুবন আর অষ্ট বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করে। সপ্তভুবনে লুকিয়ে আছে তন্ত্রের ষটচক্র আবার গায়ত্রী—ভু, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপ আর সত্য। একটি উর্ধ্বলোকের উত্থান সোপান। অধোলোকেও সাতটি তল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহীতল, রসাতল আর পাতাল। এইবার অষ্ট বৈকুণ্ঠের পরিচয় হল, শ্রীবৈকুণ্ঠ, কৈবল্য বৈকুণ্ঠ, কারণার্ণব বৈকুণ্ঠ, শেষশায়ী বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ, গর্ভোদকশায়ী বৈকুণ্ঠ আর কৈলাস।

এই দীর্ঘ, দুস্তর, সাধন-পথ ধরে এগোতে হবে। পথের শেষে 'ওমেগা পয়েন্টে' অপেক্ষায় রয়েছেন ভগবান হাত দুটি বাড়িয়ে। সেই কারণেই বোধহয় প্রভুর হাত দুটিই সার। আর দূরবীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জগৎ পথের দিকে জগাতের নাথ। দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং। রথারূঢ়ো গচ্ছন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই ওড়িশার বৈষ্ণবদের সাধন-পথ। ব্রজযানী বৌদ্ধ আর নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবও পড়েছিল। তাঁদের সম্মিলিত দর্শন হল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব হলেন পঞ্চমাত্রা, পঞ্চভূত, পঞ্চবীজ, পঞ্চদেব এবং জীব ও পরমাত্মার মিলিত তনু। মানুষ বাইশ রকমের অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ দেবতার কাছে। বাইশ রকমের পাপ। ওই বাইশটি ধর্ম সোপান উল্লঙ্ঘনে বাইশটি পাপ-স্খলন। বাইশটি ধাপ বাইশটি তীর্থভূমি। পবিত্র থেকে পবিত্রতর হতে হতে পুরুষোত্তম প্রাপ্তি। মূর্তির অভ্যন্তরে আছে ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মের অপার মহিমা লাভ।

কিন্তু তিনি কে? বৈষ্ণব অথবা শাক্ত। শবরের সেবা অস্বীকার করে রাজা হলেন ওড্র দেশে। নীল পর্বতে। সমুদ্রের তটে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। গোপীদের কাঁদিয়ে, বৃন্দাবনে ভাসিয়ে, 'লাল পাগুড়ি দিয়ে মাথে, রাজা হলেন মথুরাতে।' আবার গীতায় বসে অর্জুনকে বললেন, সখা! 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম। যে যেভাবে, যে রূপে আমাকে চায় আমি সেই ভাবে সেই রূপেই তার সেবা, পূজা গ্রহণ করে

প্রার্থিত ফল দান করি।

ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট বিষ্ণু বললেন, এটি আমার ক্ষেত্র। এখানে আমি চির আসীন অক্ষয় বট। সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী আমার ক্রোড়ে আসীন। আমি অক্ষয় বট। এখানে পাপ পুণ্যের বিচার নেই। যমের দণ্ড অচল। এখানে একটি কাকও মৃত্যুর পর সাযুজ্যলাভ করে। তীর্থ যজ্ঞ, দান ধ্যানে যে ফল, এই ক্ষেত্রে একদিন মাত্র বাস করলে সেই ফল লাভ। নিমেষমাত্র বাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

যমরাজ বললেন, সে ত হল, এই ক্ষেত্রের এমন জগৎ ছাড়া মহিমা হল কী করে, যেখানে আমার শাসন অচল? শ্রীবিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীকে বললেন, 'বলে দাও'। শ্রী তখন শ্রীক্ষেত্রের শক্তি বলয়ের কথা বললেন, এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত এলাকায় তোমার দণ্ড অচল। তাহলে শোনো, এই অন্তর্বেদীটি রক্ষার জন্যে আমি আটটি শক্তি কল্পনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে মহাদেব উগ্রতপস্যা শুরু করলেন। আমি তখন আমার শরীর থেকে সুন্দরী গৌরীকে তার পত্নীরূপে সৃজন করলুম। গৌরীকে আদেশ করলুম, এই অন্তর্বেদীর চতুর্দিক রক্ষা করো। সেই গৌরী আমার প্রীতির নিমিত্ত অষ্টপ্রকার মূর্তি ধারণ করে অষ্টধা দিক্ষু সংস্থিতা।

বটমূলের অগ্নি কোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পূর্বভাগ বায়ু কোণে সর্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্ধাশনী, ঈশান কোণে লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রী, পূর্বদিকে মরীচিকা, নৈঋতে চণ্ডরূপা। এতাভিরুগ্ররূপাভিঃ শক্তিভিঃ পরিরক্ষিতম। এই ভীষণারূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্বেদী সর্বতোভাবে রক্ষিত।

ক্ষেত্রস্বামী ভগবান বিষ্ণু। রুদ্রাণীর অষ্টশক্তির দ্বারা রক্ষিত। এখন রুদ্র কী করেন। তিনি ভগবানকে বললেন, তুমি যেখানে আমিও সেখানে, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। রুদ্র আট ভাগে বিভক্ত হলেন। ক্ষেত্রস্বামী ভগবান সেই অষ্টরুদ্রকে আটদিকে রেখে নিজে বসলেন মাঝখানে।

মহাদেব নিজেকে এই ভাবে সাজালেন, কপালমোচন, (১) কাম (২) ক্ষেত্রপাল (৩) যমেশ্বর (৪) মার্কণ্ডেয়েশ্বর (৫) বিশ্বেশ্বর (৬) নীলকণ্ঠ (৭) বটমূলে বটেশ্বর। (৮) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী সবাই এসে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন। আপনি এই অত্যজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ বালুকায় আবৃত হয়ে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যোগের আহর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে আসবেন, মহাভক্তি প্রকাশ করবেন। ভগবান তাঁকে অনুগ্রহ করে একটি দারুতে উৎপন্ন হবেন।

এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবংশীয় শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন মালবদেশে এলেন। অবন্তীনগরে তাঁর রাজধানী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ সত্যযুগের সূচনা হল। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় ভগবৎ প্রেরিত এক বৈষ্ণব এসে শ্রীশ্রীনীলমাধবের কথা শুনিয়ে গেলেন। ব্যাকুলের ব্যাকুলতা গেল। দিকে দিকে অনুসন্ধানকারীরা বেরিয়ে পড়লেন অনুসন্ধানে। অনার্যদেশে রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি সুকৌশলে সন্ধান পেলেন শবর পূজিত নীলমাধবের। শবরের নাম 'বিশ্বাবসু'। শুরু হল জগন্নাথ

কাহিনী। দীর্ঘ সময় দীর্ঘ কাহিনী। পূবেই এই সূত্রপাত কাহিনীর আর একটি রূপ বলা হয়েছে।

আবার ফিরে আসি বাইশধাপের তৃতীয় ধাপে। এই ধাপ পবিত্রতম। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের অভিষেক। এই অভিষেকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব দেব দেবী নীলাচলে নেমে এসেছেন। শিব তখনো কাশী থেকে এসে পৌঁছতে পারেননি। বৃদ্ধ বৃষভ বাহনে চড়ে শিব যখন এলেন জগন্নাথদেব তখন রত্নবেদিতে আরোহণ করে গেছেন। নেমে শিবকে অভ্যর্থনা করার উপায় নেই। বিশ্বনাথ তৃতীয়ধাপ পর্যন্ত উঠে অপেক্ষা করছেন, জগন্নাথ দেব এসে অভ্যর্থনা করবেন। এদিকে অভিষেক শুরু হয়ে গেছে। জগন্নাথ সিংহাসন ছেড়ে উঠতে পারছেন না। বিশ্বনাথ অপমানিত বোধ করে তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আর এগোচ্ছেন না। কথাটা জগন্নাথদেবের কানে গেল। জগন্নাথদেব বললেন, শিব ওইখানেই অবস্থান করুন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময় আমি তাঁকে দর্শন করব। রথযাত্রার প্রথম দিনে মন্দির থেকে বেরিয়েই দুই দেবতার সাক্ষাৎকার। সবাই জানেন, জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে বিশ্বনাথের দর্শন জগন্নাথ দর্শনের মতোই সমান ফলপ্রদ। মন্দিরে যাঁরা আসেন তাঁরা প্রথমেই বিশ্বনাথ দর্শন করেন, পরে জগন্নাথ। এর বিপরীত হওয়ার উপায় নেই। তৃতীয় ধাপেই পুণ্য ফল লাভ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর পেরিয়ে আমরা কলিতে কলকল করিতেছি। পুরাণের কাল, রাজন্যবর্গের কাল অতিক্রম করে গণতন্ত্রে বসবাস। আধুনিক শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দুর্গে সময় স্থির। জগন্নাথের অনন্তের ঘড়িতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ স্থির। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মিলিত তনু। পীঠদেবী বিমলা।

প্রভু কোন মাসে কী বেশ ধারণ করেন? বেশের রূপান্তর। বৈশাখে চন্দন বেশ। প্রভু মদনমোহন। জ্যৈষ্ঠে হস্তিবেশ। প্রভু তখন গণেশ। স্নানযাত্রার পরে প্রভুর গজানন বেশ ধারণের একটি গল্প আছে। কর্ণাট দেশের কানিয়ারি গ্রামের গণপতি ভট্ট স্নানযাত্রার দিন লীলাচলে এলেন। তিনি ছিলেন গাণপত্য ব্রাহ্মণ। দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবকে গণপতি মূর্তিতে দেখতে না পেয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, 'ব্রহ্ম নীলাচলে নেই'। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু জগন্নাথদেব ব্রাহ্মণের ঐকান্তিক বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে গজানন রূপ প্রকট করলেন। গণপতি ভট্টের প্রার্থনা অনুসারে 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' স্নানযাত্রা-মহোৎসবের পরে প্রভু গণেশবেশ ধারণ করেন। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা একাদশীতে তাঁর রুক্মিনীহরণ বেশ। আষাঢ়ে গুণ্ডিচা থেকে ফিরে আসার পর স্বর্ণবেশ। শ্রাবণে পর পর দুটি বেশ, চিতালাগি বেশ আর রাহুরেখালাগি বেশ। ভাদ্রমাসে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ লীলা। প্রথম বনভোজন বেশ, তারপর কালিয় দমন বেশ, প্রলম্ববধ বেশ, অবশেষে বামন বেশ। আশ্বিনে তাঁর রাজবেশ। কার্তিকে তাঁর অনেক রূপধারণ। লীলা জমজমাট। শ্রীরাধাদামোদর, ত্রিবিক্রম, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, সব শেষে রাজাধিরাজ। অঘ্রাণে শীতবস্ত্র অঙ্গে, যার নাম ওড়ন। মাঘ মাসে পদ্মবেশ। মাঘী পূর্ণিমায় গজোদ্ধারণ বেশ। বসন্ত পঞ্চমীর দিন চাঁচেরি বেশ। ফাল্গুনে কুণ্ডলবেশ, দোল-পূর্ণিমায় রাজবেশ। চৈত্রে প্রভু রামরাজা বেশে শ্রীরামচন্দ্র।

প্রভুর পূজা হবে কোন মন্ত্রে? 'রাজভোগ' অপ্রকাশিত একটি পুঁথি। সেখানে আছে পূজাবিধি। তিনজন পুরোহিত তিন দেবতার পূজায় বসবেন। বাসুদেব মন্ত্রে বলভদ্রের পূজা, ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে সুভদ্রার আর মন্ত্ররাজ নৃসিংহ মন্ত্রে জগন্নাথদেবের। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আদেশ পেয়েছিলেন, প্রভুকে নৃসিংহ মন্ত্রে পূজা করবে। নরসিংহের পরিচিত মূর্তি হল, একটি মস্তক ও দুটি হাত।

জগন্নাথদেবের প্রসাদ রূপান্তরিত হবে মহাপ্রসাদে। কী ভাবে? আবার পুরাণ। দেবী বিমলা প্রভু জগন্নাথকে তাঁর মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন একটি শর্তে। জগন্নাথদেবকে নিবেদিত অন্নভোগ পরিচিত হবে 'প্রসাদ' নামে। এইবার সেই প্রসাদ নিবেদিত হবে বিমলার কাছে। বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে। জগন্নাথদেব শর্ত মেনে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহা-প্রসাদ। স্বয়ং ব্রহ্ম। সারা ভারতের মানুষের কাছে একটি মহাবস্তু। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন আর রত্নবেদিতে দাঁড়িয়ে দেবতারা গ্রহণ করেন।

সবচেয়ে রহস্যময় এই রত্নবেদী। দারুবিগ্রহে নয় এই রত্নবেদিতেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত রহস্য। একাধিক পণ্ডিতের এই অভিমত। তাঁরা বলছেন, এই মহাদেবীই প্রকৃত সিদ্ধপীঠ, মহাপুণ্যক্ষেত্র। লক্ষ শালগ্রাম শিলায় তৈরি। 'জগন্নাথের সিংহাসনটি ফাঁপা। গর্ভগৃহের মৃদু আলোয় ভাল করে দেখা যায় না। এই সিংহাসনের মধ্যে গুপ্ত দ্বার রয়েছে। এই সিংহাসনের ফাঁপা অংশে রয়েছে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্ত্র। অতিগুপ্তভাবে রক্ষিত। তাই ভোগ নিবেদন এই সিংহাসনের উদ্দেশেই করা হয়। সিংহাসনহীন বিগ্রহের কোনো তাৎপর্য নেই। তাই রথের সময় জগন্নাথদেবের প্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' বলে না।'

স্নানযাত্রায় 'স্বর্ণকূপের' ১০৮ ঘড়া জলে স্নান। তারপর পনেরো দিন অসুস্থ। এই পনেরো দিন মন্দিরের দরজা বন্ধ। এই সময়টিকে বলে অনবসর কাল। যেহেতু পূজার অবসর থাকে না, সেইহেতু 'অনবসর'। এই সময় বিগ্রহদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় শবর দয়িতাদের হাতে। তাঁরাই যে প্রভুর অতি আপনজন। একদা অরণ্যে অধুনা রাজন্যে। এই অনবসরে বিগ্রহ-সেবায় ব্রাহ্মণরা অনধিকারী। ব্রাহ্মণ পূজারীদের যে-অধিকার নেই শবর দয়িতাদের সেই সব অধিকার আছে। এক আসনে বসে দেবতাদের নৈবেদ্য নিবেদন করে নিজেরাও আহার করেন। ফল সুস্বাদু কি-না নিজেরা চেখে দেখে ভগবানকে দেন। সন্তান ভগবান, অতি আপনজন। শাস্ত্রের শাসনমুক্ত স্নেহের পূজা। অনবসরকালের এই পূজা 'গুপ্ত পূজা', লোকচক্ষুর আড়ালে। দরজা বন্ধ করে। এ হল তান্ত্রিক রীতি। পূজারী বলছেন, নে খা। মাঝে মাঝে এমন পূজা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও করে গেছেন ভাবমুখে।

মহাপ্রসাদ তান্ত্রিক শব্দ। মহাপ্রসাদে বলির ছাগমাংস থাকা চাই। ভৈরবী চক্রে জাতিবর্ণ

নির্বিশেষে কৌলরা সাধনায় বসবেন। পঞ্চমকার পরিচিত শব্দ। বিমলা, কমলা চক্রে অধিষ্ঠিতা ভৈরবী। জগন্নাথ স্বামী ভৈরব, রত্নবেদিতে ত্রিপুরাযন্ত্রে অধিষ্ঠিত।

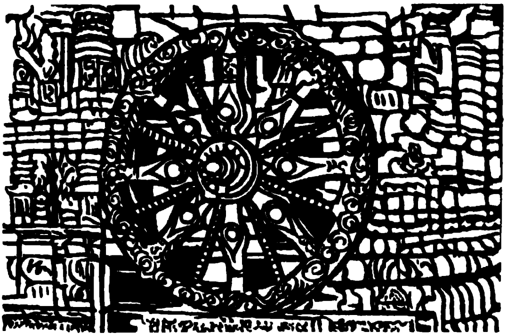
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিমলা সর্বেশ্বরী। কষ্টি পাথরে নির্মিত দেবী-মূর্তি। দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজা। চার হাতে ত্রিশূল, খড়্গ, খর্পর আর রুদ্রাক্ষমালা। তিনটি চোখ সোনার। দেবীর দুপাশে প্রস্তরনির্মিত দুটি মূর্তি, ছায়া আর মায়া। ভারতের চারটি সিদ্ধপীঠের একটি। জ্বালামুখী, কামাখ্যা, কন্যাকুমারী, বিমলা। মা দুর্গাই তন্ত্রে বিমলা। প্রধানা সর্বশক্তিনাং বলা বলবতী পরা। সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিনি। ধ্যানমন্ত্র-চণ্ডীর ধ্যান। বীজমন্ত্র ওঁ হ্রীং। অনুকল্প পঞ্চমকারে তাঁর পূজা। মৎস্য-হিং দিয়ে রান্না করা শাক। মাংস—আদা কুচি। মদ্য-কাংস পাত্রে ডাবের জল। মুদ্রা—জলে গোলা ময়দা আব চিনি। মৈথুন—রক্তচন্দন মাখানো অপরাজিতা ফুল। তারপর আসবে শারদোৎসব। ষোল দিনের বিশেষ পূজা। পূজার পুরোহিত হবেন নরসিংহপুবের রথ সামন্তগণ, বোড়ঙ্গেব প্রাচীন বক্সীদের কেউ কেউ নির্বাচিত হবেন তন্ত্রধারক। জগন্নাথদেব তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠাবেন, ভৈরব দুর্গামাধব। তিনি ছোট্ট একটি বিগ্রহ হযে বসবেন দেবীর ডান পাশে। এই ষোলো দিনে দেবী ধাবণ করবেন বিভিন্ন বেশ। প্রথম দিন, বিমলা, দ্বিতীয় দিনে ভুবনেশ্বরী, তৃতীয় দিনে বন দুর্গা, চতুর্থদিনে রাজরাজেশ্বরী, পঞ্চম দিনে উগ্রতারা, ষষ্ঠদিনে মাতঙ্গিনী, সপ্তম দিনে বগলা, অষ্টম দিনে নারায়ণী, নবমদিনে সিংহবাহিনী, দশম দিনে জয়দুর্গা, একাদশ দিনে শূলীদুর্গা, দ্বাদশ দিনে হরচণ্ডী, শেষ চারদিন আবার বিমলার বেশ।

এইবার এসে যাবে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। আর অনুকল্প পূজা নয়। পুরোপুরি 'রহস্যপূজা'। থমথমে মধ্যরাত। অন্ধকার সমুদ্রে ফসফরাসের খিলখিল হাসি। আকাশের এক কোণে সপ্তমীর মৌলী চাঁদ। মন্দিরের দরজা বন্ধ। আসনে প্রবীণ তান্ত্রিকরা। পুরুষোত্তম পীঠ এই রাত তন্ত্রপীঠ, বিমলাপীঠ। ভোগে নিরামিষ নয় প্রকৃত মৎস্য। হাড়িকাঠে একটি মেষ। জগন্নাথদেব আজ ভৈরব। গা ছম ছম ওই পরিবেশে, তরল আলোর অন্ধকারে ভাসিয়ে দি সেই মন্ত্র—মা বিমলা—

মোক্ষকামী লভতে ভক্তিং দর্শনাৎ বিমলেশ্বরীম্।
যশোজ্ঞানবলাকাঙ্ক্ষী লভ্যত সিদ্ধিংনিশ্চিতম্॥
উগ্রসিদ্ধিং লভতে কামী সর্বেষাং সিদ্ধিদায়িকে।
যথাভক্তিস্তথা সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

এইভাবেই দিন যাবে। অনন্তসমুদ্র অনন্ত কাল ঢেউয়ের হিসেব করবে। সুবর্ণবালুকাবেলা ব্রহ্মস্বরূপ। পুরুষোত্তম অস্তিত্বের চিরসাক্ষী। অনন্তভক্ত স্রোত। অসম্ভব এই পুরুষোত্তম। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অত বড় জ্ঞানী আচার্য শঙ্কর এইটুকুই বলতে পেরেছিলেন, 'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'।

[ঋণস্বীকার ঃ স্কন্দপুরাণম, সুশীল মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ]



গুরু কোথায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, গুরু কোথায়? স্বামীজী বললেন, শিক্ষক কোথায়? অবশেষে দেখা গেল, গুরু আর শিক্ষক একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি জানতেন, সবাই সাধক কিংবা সন্ন্যাসী হতে পারবে না। ত্যাগের পথ বৈরাগ্যের পথ অতি কঠিন। ভেতরে সে-সুর না বাজলে বৃথাই ভেকধারী, ভণ্ড তপস্বী। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে বিজয়কৃষ্ণকে সাবধান করলেন—বিজয়! সাধু চিনতে ভুল করো না। সাধুর বগলে পোঁটলা-পুঁটলি দেখলে বুঝবে, সে সন্ন্যাসী নয়। সে ঈশ্বরের খোঁজে আদৌ ব্যস্ত নয়, সে ব্যস্ত ভাণ্ডারার খোঁজে। তার কথা হরিকথা নয়, অমুকবাবু কাল ক্যায়সা খিলায়া!

বিষয়-বৈরাগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—সে লক্ষজনে একজন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ সংসারি মানুষের আদর্শ মানুষ হতে ত আপত্তি নেই! তেমন মানুষ তৈরি করতে হবে। সে মানুষ স্কুল-কলেজে হবে না। তেমন মানুষ তৈরির পদ্ধতি ভিন্ন।

দক্ষিণেশ্বরের সাধন ভূমিতে উঠে দাঁড়ালেন শিব। বুকে-বাঁধা শক্তি মুক্তি পেলেন। রামকৃষ্ণরূপী শিব শক্তিকে মুক্ত করে দিলেন, পরাধীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বুকে। কে ধারণ করবেন সেই অমিত শক্তিকে। 'কে আছে এমন, জীবন করিবে দান!'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে হলেন গাণ্ডিবধারী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের রথে। শক্তির বাণ আপতিত হল দক্ষিণেশ্বর হতে বহু দূরে জয়রামবাটীর এক কন্যার পরে। বালিকা। গ্রামীণ পরিবেশ। তুলোর ক্ষেতে মায়ের সঙ্গে তুলো আহরণ করে। দাওয়ায় বসে পৈতের সুতো কাটে তকলিতে। আমোদরে স্নান করে। সমবয়সীদের সঙ্গে পুতুল খেলে। কিন্তু বালিকাটি অবশ্যই একটু অন্যরকম। যেন একটু গম্ভীর। চপলা নয়। বিবাদ করে না। বরং বিবাদ মিটিয়ে দেয়। পরিবারের আর্থিক অবস্থা, ধনীও নয়, দরিদ্র নয় মোটামুটি দিন চলে যায়। সাধু হতে হলে, 'বিরজা হোমে' নাম পর্যন্ত

বিসর্জন দিয়ে নতুন পরিচয়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। আমার পিতা নেই, মাতা নেই, জাতি, কুল, শীল নেই। আমার সাংসারিক, সামাজিক সব পরিচয় দগ্ধ হল। আমার 'আমি' ছাই হল। এমন কি আমার ধর্মও নেই। আমি ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর ছাড়া এই দুনিয়ায় আমার কেউ নেই।

জয়রামবাটীর সেই অলৌকিক কন্যাটির জীবনে এমনই একটি ঘটনা ঘটে গেল প্রথম শৈশবেই। কেউ তখন বোঝেননি তার তাৎপর্য। আত্মকথা বলতে গিয়ে সেই তুচ্ছ ঘটনাটি তিনি যখন বললেন, তখন যেন ইঙ্গিত করলেন, বুঝে নাও, কার নির্দেশে এই জীবন চলছে। 'আমার মা আমার নাম রাখলেন ক্ষেমঙ্করী। আমি হবার আগে, আমার যে মাসীমা, তাঁর একটি মেয়ে হয়। সেই মেয়ে মারা যাবার পর আমি হই। মাসীমা আমার মাকে বললেন, "দিদি, তোর মেয়ের নামটি বদলে সারদা রাখ, তাহলে আমি মনে করব, আমার সারদাই তোর কাছে এসেছে আর আমি ওকে দেখেই ভুলে থাকব।" তাই ত আমার মা আমার নাম রাখলেন সারদা।'

ওই নাম শুধু মাসীমাকে নয় জগতের সমস্ত তাপিত মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে। তিনি বলবেন, 'আমি সকলের মা, পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা'। রচিত হবে অপূর্ব সেই প্রার্থনা, দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং, যেগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীং। তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং, দয়াস্বরূপাং, প্রণমামি নিত্যম্।। তুমি আনন্দময়ী, শরণাগতের বিপদবিনাশিনী।

প্রথম ত্যাগ, নাম। ক্ষেমঙ্করী নয়, সারদা। কল্পনা আর কবিতা মাখা একটি নাম। পরবর্তীকালে যা বহু মানুষের বীজমন্ত্র হবে। মোক্ষের দুয়ার খুলে যাবে। জননী শ্যামাসুন্দরী সাশ্রুনয়নে বলবেন, 'তোকেই যেন আবার আমি পাই মা।' আর তাঁর ভাই বলবেন, 'দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে দিদি কী না করেছেন। ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না-বান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশি কাজই তো দিদি করেছেন।'

কোথায় সেই অবাক অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে এক বিচিত্র পাঠশালা খুলে বসে আছেন। মানুষের জীবনের একটি বড় অঙ্গ হল ধর্ম। বিরাট একটা প্রশ্ন। দেহধারী এই অপরূপ প্রাণীটি জগৎ-সংসারে জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল, সবাই বলছে, ভগবান জানেন, ভগবান আছেন, ভগবান দেখবেন, ভগবান রক্ষা করবেন। কোথায় সেই অলৌকিক, সর্বাচ্ছেন্নকারী পরমপুরুষ। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ভাগবত। ভজন, সাধন। তিনিই নিত্য, আর সব অনিত্য। এ কী সব কথার কথা। না সার কথা। মানুষ ভগবানকে ভয়ে ডাকে, না আপন জ্ঞানে ভক্তিতে ডাকে? সে ডাকে তিনি কি সাড়া দেন। ঈশ্বর-লাভের অর্থ কী? ধন, দৌলত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। জ্ঞানীর বিশ্লেষণে তিনি সাড়া দেন, অথবা ভক্তের সকরুণ ডাকে। কি নামে তাঁকে ডাকা যায়, গড, আল্লা, ভগবান। কোন শাস্ত্র ধরে এগোতে হয়?

শুরু হল পূজারীর নিবিড় সাধনা। অরণ্যে, কি পর্বত গুহায়, কি মরু-প্রান্তরে যেতে হল না। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণ রূপান্তরিত হল তপোভূমিতে। সাধনার ইতিহাসে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। সব উল্টে গেল। সাধারণত এই হয়, আগে গুরুকরণ, তারপর সাধন, তারপর ইষ্টদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে হল বিপরীত। আগে দর্শন, তারপর একের পর এক গুরুর আগমন, শাস্ত্র ধরে বিভিন্ন সাধন। দর্শন আগেই হয়ে গেছে! রহস্য উন্মোচিত। লক্ষ্য স্থির। সংশয়ের অবসান। পরের সাধন শুধু পথের যাচাই। সব নদীই কি সমুদ্রে যাচ্ছে? সব রুচিরই কি শেষ আস্বাদন সেই পরমকারণ? সব পথ ধরে এগিয়ে সেই একই প্রাপ্তি! এখন প্রত্যয় সহকারে বলা যেতে পারে কি—'যত মত তত পথ'—অবশ্যই।

রত্ন ভাণ্ডার পাওয়া হয়ে গেছে। সাধন-সাগর মন্থনের ফলে অমৃতের কলস উঠেছে। এখন ভাগ করে নেওয়ার পালা। এ যে অশেষ ভাণ্ডার। নিঃশেষ হবে না কোনোদিন। অনন্তের অন্ত পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যাঁকে পেয়েছেন, তিনি নারী। তিনি মা। এই মায়ের শরীর চাই যে! রাসমণি যাঁকে পাথরে বেঁধেছেন, তাঁকে যে এইবার জীবন্ত নারী শরীরে বাঁধাই করতে হবে। আধার চাই। আধারভূতা। জয়রামবাটীর প্রান্তরে একাকিনী বালিকা। নিষ্পাপ এক প্রাণ। মেয়েটি একেবারে অন্যরকম। খুব সাদাসিধে, ভীষণ সরল। গ্রামে জগদ্ধাত্রী পুজো। সারদা মায়ের সামনে বসে ধ্যান করছেন। হলদেপুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল প্রতিমাদর্শনে এসেছেন। তিনি দেখছেন, দুই জগদ্ধাত্রী মুখোমুখি। সারদাও জগদ্ধাত্রী হয়ে গেছেন। মৃন্ময়ীর সামনে চিন্ময়ী। ঘোষাল মশাই ভয় পেয়ে গেছেন। তিনি পালিয়ে গেলেন!

গরুড় পক্ষীর মতো শ্রীরামকৃষ্ণ ঠোঁটে করে তুলে আনলেন সারদাকে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী যে-আধারে সমাবিষ্ট। যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনা/ আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী। কিছুদিন পরেই যে মানবযজ্ঞ শুরু হবে সেই যজ্ঞের যজ্ঞলক্ষ্মী হবেন মা সারদা। নৃসিংহরূপী ব্রহ্মের প্রকাশাত্মিকা শক্তিই মহালক্ষ্মী—ইনি ভুরাদি ব্যাহৃতিযুক্তা প্রণব বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, পরমার্থবিষয়া।

ঘোষালমশাই সারদা শরীরে জগদ্ধাত্রী দর্শন করে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দেবী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী অভিন্ন। পার্বতীরই অপর নাম জগদ্ধাত্রী। সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তুতে। তুমি দয়ারূপা। সারদা মাতা তুমি দয়ারূপা, তোমার দৃষ্টি করুণা ভরা, দয়াতে তোমার হৃদয় নিত্য দ্রবীভূত, তুমি জীবের দুঃখ মোচন কর, বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং/বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং।

'হ্যাঁ, তুমি আমার শক্তি'। শ্রীরামকৃষ্ণ জনৈকা মহিলা ভক্তকে বললেন, 'ও কি যে সে! ও আমার শক্তি। জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী।' ভাগিনেয় হৃদয়কে একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'একে (নিজেকে দেখিয়ে) তুই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলিস বলে ওকে (শ্রীমাকে) আর কখনো কটু কথা বলিসনি। এর ভেতরে যে আছে,

সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওর ভেতরে যে আছে, সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবেন না।'

স্বামীজী আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন, একটি চিঠিতে লিখলেন, 'দাদা, জ্যান্ত দুর্গাপূজা দেখাবে, তবে আমার নাম। মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা ওই যে বলেছি, ওখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বল দাদা; কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।'

ভক্তির আতিশয্যে মানুষ পাথরের টুকরোকে শালগ্রাম বলে সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করতে পারে, ভোগ লাগাতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার, তাঁর সহধর্মিনী, সুতরাং পূজনীয়া। শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেক পরীক্ষায় পাস করতে হয়েছিল। মা সারদা বলেছিলেন, ঠাকুরকে 'বিরে' নিয়েছিল। অর্থাৎ পরীক্ষা করে নিয়েছিল। 'কো রামকৃষ্ণ'! রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে পরীক্ষা করিয়েছিলেন, সত্যই কামজয়ী কি না। মথুরবাবু কায়দা করে মেছুয়াবাজারে বাইজী বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সমাধিস্থ ঠাকুরের চোখের মণিতে আঙুল ঠেকিয়ে সন্দেহবাদীরা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল, ঢং, না প্রকৃত সমাধি। সব চেয়ে বেশি পরীক্ষা করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। বিছানার তলায় লুকিয়ে টাকা রেখেছিলেন। টাকার স্পর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ঝন্ ঝন্ করত। হাতের আঙুল বেঁকে যেত। বিছানায় বসামাত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ উঃ বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন। সমাধিস্থ ঠাকুরকে গরম কল্কের ছ্যাঁকা দিতে চেয়েছিলেন। শেষ শয্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ। রোগ যন্ত্রণা। পাশে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ, ভাবছেন এখন যদি বলতে পারেন, আমি অবতার! শ্রীরামকৃষ্ণের রোগক্লিষ্ট ঠোঁটে হাসির রেখা। অস্ফুটে বললেন, এখনো অবিশ্বাস!

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দুজনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রহণযোগ্যকেই মানুষ গ্রহণ করে। কাচকে হিরে বলে চালানো যেতে পারে। পাকা জহুরী ধরে ফেলবে। কাল সেই জহুরী। ঠাকুর ভক্তদের প্রায়ই সাবধান করতেন, 'সাধুকে দিনে দেখবি। রাতে দেখবি। বাজিয়ে নিবি। হাঁড়ি কেনার সময় টংটং করে বাজিয়ে নিতে হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকেই নিজে বাজাতে চাইলেন। তিনি 'মা' তৈরি করতে চাইছেন। যাঁর একটি দুটি নয় হাজার হাজার সন্তান হবে। তাদের মধ্যে একটি সন্তান তিনি স্বয়ং।

তোতাপুরীর কাছে যখন সন্ন্যাস নিলেন, তখন সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, আমি যে বিবাহিত। গুরু তোতাপুরী বললেন, বহুত আচ্ছা। হাতে নাতে পরীক্ষা হবে তোমার, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পার কি না। ইন্দ্রিয় সংযত হয়েছে কি না।

শ্রীমা একাদিক্রমে আটমাস ঠাকুরের সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করেছিলেন। অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ এই বললেন, 'ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে আমাকে

আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কি না, কে বলতে পারে? বিয়ের পরে 'মা'কে ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম, 'মা,আমার পত্নীর ভেতর থেকে কামভাব এক কালে দূর করে দে।' ওই সঙ্গে একত্রে বাস করে এই কালে বুঝেছিলাম, 'মা সে-কথা সত্যসত্য শুনেছিলেন।'

এই দিব্য সম্পর্ক গড়ে তোলার কারণ! শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেন শ্রীমাকে, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?' শ্রীমা-র দৃঢ় উত্তর, 'তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতেই এসেছি।' অর্থাৎ তুমি গুরু, আমি তোমার শিষ্য। এতকাল পুরুষের সাধন জগতে নারী ছিলেন ব্রাত্য। বড় বড় সাধকরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এইটিই বলতে চাইতেন, নারী নরকের দ্বার। নারীর এত বড় অবমাননা আর কী হতে পারে! বেদে অধিকার নেই, চণ্ডীপাঠের অধিকার নেই, শালগ্রাম স্পর্শ করার অধিকার নেই! নারী কি তাহলে শুধুমাত্র পুরুষের ভোগ্যপণ্য, দাসী, বাঁদী, গণিকা, সন্তানের জন্মদানের যন্ত্র! এ কী কথা? তোমরা 'মা' বলে ডাক কোন আক্কেলে! দেবী মূর্তির পূজা করো! গরম গরম মন্ত্র পড়, অথচ জীবন্ত রমণীকে দেখ কামনার দৃষ্টি নিয়ে! দিকে দিকে চণ্ডীপাঠ! লক্ষবার বলছ—স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু—সব রমণীই মাতৃরূপা, অথচ কাজে করছ কী! সংসারের হাঁড়িকাঠে বলি দিচ্ছ।

শ্রীরামকৃষ্ণ এক বিপ্লবী! ঠাকুর আর মা অদ্ভুত এক টিম। ধর্মের জগতে শক্তিশালী এক বিস্ফোরণ! গীতার মানে জান? পর পর গীতা গীতা গীতা বলে যাও। কী শুনবে? তাগী, তাগী। অর্থাৎ ত্যাগী। শাস্ত্র তাকে তুলে রাখার জন্যে নয়। ধর্ম ধারণ করার জিনিস! জীবন থেকে পালানো নয়, ছুঁচের ফোঁড়ের মতো জীবনে জীবন গাঁথা। ধর্ম ইয়ারকির জিনিস নয়। রঙের গামলা। তুমি যে-রঙ চাও, সে রঙে নিজেকে ছুপিয়ে নাও। ধর্মের জন্যে আলাদা কোনও পোশাক নেই। লুঙ্গি, হ্যাটকোট, ধুতি-পাঞ্জাবি, কৌপিন সবই চলতে পারে। চোখ উলটে দম বন্ধ করে, ডিগবাজি খেয়ে ঈশ্বরকে ডাকার দরকার নেই। আগে বিশ্বাস, তারপর 'মা' বলে ডাকা। 'বাবা'ও বলতে পার। 'দাদা'ও বলতে পার। তবে সম্পর্কটা যেন পাকা হয়। আসল কথা মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখ। দয়ার মনোবৃত্তি নয়, সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। গুরুগিরি আর বেশ্যাগিরি এক। মানুষের গুরু একজন, তিনি পরমেশ্বর।

বিদায়ের আগে রোগশয্যায় শুয়ে স্ত্রীর সঙ্গে শেষ কথা, পারবে না তুমি? পারবে না! অন্ধকারে যারা পোকার মতো কিলবিল করছে তাদের আলোয় আনতে পারবে না? আমি কী করেছি, তোমাকে আরো, আরো, আরো, করতে হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচন ছাড়াই জয়রামবাটীর লক্ষ্মী, সারদা হলেন নেত্রী। আমাদের মা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শক্তির জন্যে ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ কী দিয়ে গেলেন, 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।'

দুঃখের, দারিদ্র্যের আগুনে পুড়ে বেরিয়ে এলেন সেই মা। জাতিভেদ মানেন

না। সংস্কার মানেন কুসংস্কার মানেন না। নীচতা সহ্য করতে পারেন না। দেহ, দৈহিক কষ্ট ভ্রুক্ষেপ করেন না। উদার মনোভাব। অসীম সাহস। তেলেভেলোর প্রান্তরে একাকী এই রমণী ডাকাত দম্পতির হৃদয় হরণ করলেন। হরণ করতে এসে চিরকালের জন্যে হৃত হল দস্যুদম্পতি। ভক্ষক হল রক্ষক। লাঠি হাতে মেয়েটিকে আগলে আগলে নিয়ে এল তারকেশ্বরের চটি পর্যন্ত। বিদায় মুহূর্তে পাষাণের চোখে জল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমার অনেক বিচার ছিল, তেমার কোনো বিচার থাকবে না। ভক্তের যেমন জাত নেই, সন্তানেরও সেই রকম জাত নেই। ভালয়-মন্দয় মেশানো এই পৃথিবী। সব রকমের পাওনা হাসি-মুখে বুঝে নিতে হবে। শ, ষ, স—সহ্য করো, সহ্য করো, সহ্য করো। যে সয় সে রয়/ যে না সয়, সে নাশ হয়। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন আর যখন যেমন তখন তেমন। তাঁর গ্রামের বাড়িতে মা যখন, যখন থাকতেন দেখলে বোঝার উপায় ছিল না তাঁর প্রকৃত স্বরূপ। একেবারেই সাধারণ। শান্ত। মহাসমুদ্রের মতো। কল্লোল হিল্লোল নেই। উপদেশ দিতেন না, ধমকাতেন না, রাগ করতেন না। শুধু কাজ করতেন, কর্তব্য পালন করতেন। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর উপদেশ। আকাশপ্রদীপের মতো জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শটিকে তুলে ধরে রেখেছিলেন।

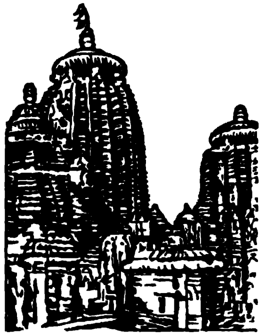
গ্রামের বুড়িরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে মায়ের কাছে ছুটে এসেছে সালিশির জন্যে। সংসারে অন্যান্যদের ভীষণ রাগ। ভ্রাতুষ্পুত্রী চড়া গলায় মাকে তীব্র গালাগাল দিচ্ছে। তোমার প্রশ্রয়ে ক্ষণে ক্ষণে, যখন তখন এসে বাড়ির শান্তি নষ্ট করছে। মা কিন্তু শান্ত। ক্রোধের সামান্যতম প্রকাশ নেই। শুধু বলতে লাগলেন, মিষ্টি কথা বল, রাধু মিষ্টি কথা বল।

কাঠের পিঁড়েতে সামনের দিকে পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছেন অবতারের শক্তি। পরিধানে নরুনপাড় কাপড়, হাতে বালা। কেউ তাঁকে চিনতে পারেননি তখনো। স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছেন, তাঁকে কে বুঝেছে, কে বুঝতে পারে? মায়ের স্থান অনেক উঁচুতে। স্বামীজীরও ওই এক কথা। জয়রামবাটীর মানুষ তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিধবা করতে চেয়েছিলেন। জনৈক বৃদ্ধা একদিন বললেন, পাগলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সংসারসুখ হয়নি। এখন শিষ্যশিষ্যা নিয়ে কিছুটা সুখের মুখ দেখছে।

নারীজাগরণের ধুয়ো তুলে পুরুষরা নাচাচ্ছে! মহাভারতে এক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হয়েছিল একালে শত শত দ্রৌপদীর লজ্জা হরণ করছেন ব্যবসায়ী দুঃশাসন। অবলাদের বোধ ছিল এই সবলারা নির্বোধ। নিবেদিতা কি বলছেন—Shall we after centuries of Indian womanhood fashioned on the pattern of Sita and Savitri descend to the creation of conquettes and Divorcees. নিবেদিতার শেষ কথা—ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের

শেষ বাণী—জননী সারদা। তিনি মা হলেন কবে! যেদিন দুর্মদ সভ্যতা মা হারা হল। যেদিন থেকে নারীকে বলা হতে লাগল সেক্স। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি—সিদ্ধিদাত্রী মা সারদা। অনেক নাচ নেচে অবশেষে, মা বাঁচাও। আমরা ভুলে বসে আছি, পৃথিবীর সব মানুষই কোনো না কোনো মায়ের সন্তান। সমস্ত মা যে শরীরে এক হয়েছেন, তিনিই মা সারদা। মাঝে মাঝে আপন মনে বলতেন, 'ঠাকুর, এত ভার আমি সইতে পারছি না।' আবার বলতেন, 'দুঃখী মানুষের ব্যথা কত বড় হলে বুঝবি। তুই তো মা নস্।' বলছেন কোনো বালকভক্তকে। তিনি স্নেহময়ী ছিলেন, স্নেহদুর্বলা ছিলেন না কিন্তু।

সারা জগৎ শিশুর মতো কাঁদছে, মা দুহাত বাড়িয়ে ডাকছেন, চলে আয় যন্ত্রণা মুছিয়ে দি। কী ভাবে? খানিকটা শক্তি ঢুকিয়ে দেবো। সেই শক্তিটা কী মা? আমার জীবন কথা। আমার চেয়ে দুঃখ কে পেয়েছে! আমার মতো যন্ত্রণা কে সহ্য করেছে!



অপূর্ব মিলন

'মা! আমি একটি স্তোত্র রচনা করেছি।'

'কী স্তোত্র? কার স্তোত্র?'

'মা, আপনার স্তোত্রগীতি।'

'বাবা, আমার আবার কী স্তোত্র?'

স্বামী অভেদানন্দজী অতি বিনীতভাবে বললেন, 'মা, আমার রচনা, আমার দর্শন, কৃপা করে শুনুন।'

মা চমকে উঠেছিলেন, বিস্মিত হয়েছিলেন। তবু শুনছেন। স্থির, ধ্যানস্থ। স্বামী অভেদানন্দজী হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে লাগলেন তাঁর সেই বিখ্যাত স্তোত্র। 'প্রকৃতিং পরমাং'। অভেদানন্দজী যখন পড়ছেন—'রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং', মা তখন স্পন্দন হীন। যখন বলছেন, 'তন্নামশ্রবণপ্রিয়াং', তখন মায়ের দু-চোখে জলের ধারা। অভেদানন্দজী বলছেন, 'তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং'। হঠাৎ অলৌকিক কিছু ঘটে গেল। আসলে মা নেই। মা সারদার জায়গায় বসে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। মা রূপান্তরিত হয়েছেন ঠাকুরে। এরপরে তাঁর মনে হল দৃশ্যে তিনিই নেই। শুধু স্তোত্রটি আছে।

ঘটনাটি ঘটছে ১৮৮৮ সালে বেলুড়ের নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে। মে মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত—প্রায় ছ'মাস মা ওই বাড়িতে ছিলেন। স্তোত্রটি শুনতে শুনতে মা চলে গিয়েছিলেন অন্য জগতে। সেখানে আলাদা ভাবে নারী আর পুরুষের অস্তিত্ব নেই। আছে প্রকৃতি আর পুরুষ। শিব আর শক্তি। যেমন সাধকের সঙ্গীতে আছে—'তারা পরমেশ্বরী, কখনো পুরুষ কখনো প্রকৃতি।' মা রূপান্তরিত হলেন। হয়ে গেলেন ঠাকুর। ঠাকুর হয়ে গেলেন মা। সেই আবেশ মিলিয়ে গেল। স্তোত্রপাঠক এবং শ্রোতা মুখোমুখি। পূর্বে প্রবাহিত গঙ্গা। মা বসে আছেন, বসে আছেন গোলাপ-মা, যোগীন-মা। মা স্বামী অভেদানন্দজীকে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসবেন।'

স্তোত্রের প্রথম দুটি চরণ কি!

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং, নররূপধরাং জনতাপহরাং।
শরণাগতসেবকতোষকরীং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্।।

মা তুমি কে? তোমার পরিচয়? তুমি আদ্যাপ্রকৃতি স্বরূপা। তুমি নরদেহ ধারণ করেছ। কেন করেছ? লোকের দুঃখ হরণ করবে। তারপর? লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে। মা জ্ঞানদান করবেন।

কুটো বাঁধা। ঠাকুর চয়ন করে আনলেন জয়রামবাটীর লোকসমাজ থেকে। ঊনবিংশ শতকের অন্ধকার একটি গ্রাম। মা এসেছিলেন ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর। দুর্গম একটি পল্লী। কলকাতা থেকে পৌঁছতে প্রায় আড়াইদিন। যাত্রাপথের বর্ণনা দিচ্ছেন স্বামী বিরজানন্দ। ১৮৯২ সালের অবস্থা। ট্রেনে বর্ধমান। একটি চটিতে রাত্রিবাস। পরের দিন প্রত্যুষ অন্ধকার থাকতে থাকতে গোযানে যাত্রা। দামোদর পার হয়ে একটি চটিতে দ্বিপ্রহরে রান্না করে খেয়ে আবার যাত্রা। উচালন চটিতে রাত্রিবাস। পরের দিন ভোরে যাত্রা শুরু। দ্বারকেশ্বর পার হয়ে দুপুরবেলা কামারপুকুর। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটীর দূরত্ব প্রায় দু ক্রোশ। মাঠের আল ধরে হাঁটা। পথে পেরতে হবে আমোদর নদ।

সুদূর গ্রামের সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডল। কৃষি ও ধর্মাশ্রিত জীবন ও সংস্কৃতি। সংস্কার আর কুসংস্কারের পীঠস্থান। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। রাজনৈতিক, সামাজিক উভয় অবস্থাই এলোমেলো। মশার উপদ্রব। ম্যালেরিয়া। পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব। শিক্ষাব্যবস্থা নেই বললেই চলে। টোল আর পাঠশালা। মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ নেই। নিজের জীবনকথা বলতে গিয়ে মা বলছেন, 'পরিবারের ছেলেরা সব পাঠশালে যেত। ওদের সঙ্গে কখনও কখনও একটু-আধটু যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম। কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে হৃদয় বই কেড়ে নিলে। বললে, মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?'

চারিদিকে পুরুষদের তর্জন, গর্জন। রমণীকুলের কণ্ঠস্বর শোনাই যায় না। ঠাকুর মাকে বলেছিলেন, 'অবলার অবলায় বৃদ্ধি, অবলার অবলায় সিদ্ধি। স্ত্রীলোক ধীর নম্রভাবে থাকবে লজ্জাই তার ধর্ম; নইলে লোকে তাকে নিন্দা করবে।' এ যেন তুলসীদাসজীর কথা ;

ভাটকা ভালো বোল্‌না চলনা বহুড়ীকে ভালা চুপ্।
ভেক্‌কে ভালা বর্ষা বাদর, অজকে ভালা ধূপ।।

যারা ভাট তারা বহু কথা বলবে, বহু পথ চলবে, সে ভাল; কিন্তু কুলবধূরা থাকবে চুপচাপ, সেইটিই হবে তাদের শিক্ষা। ব্যাঙের পক্ষে বর্ষাই ভাল, যেমন ছাগলের পক্ষে গ্রীষ্মের রোদ।

শ্রীযুক্ত গোলাপ-মাকে ঠাকুর একদিন বলছেন, 'ও সারদা-সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।' পরে আর একদিন বললেন, 'ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।'

শক্তিহীন শিব শব। শিব কি করেন, সকল জীবের প্রভু। তাই তাঁর নাম ঈশান। তিনি ষড়ৈশ্বর্যশালী তাই তিনি ভগবান, দেবগণবন্দিত, তাই মহাদেব। জীবের কর্মবন্ধন মোচন অতএব তিনি পশুপতি ; তাঁর জন্মদাতা বা জন্মদাত্রী কেউ নেই, সেই কারণে তিনি স্বয়ম্ভু, তিন ঐশ্বর্যের দাতা, তাই তাঁর নাম মহেশ্বর। তাঁর মতো বৃহৎ আর কেউ নেই, তিনি সর্বপ্রকাশক তাই তিনি ব্রহ্মা।

এই শিবতত্ত্বে পৌঁছতে হলে শক্তির সাহায্য নিতে হবে। সেই কারণেই ঠাকুরের তন্ত্রসাধন। মা সারদাকে পরীক্ষা করছেন, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?' মায়ের বয়স মাত্র উনিশ। মা উত্তর দিলেন, 'না, না, আমি তোমাকে সংসার পথে টানতে যাব কেন। তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছি।' এমন অসাধারণ উত্তর মা কি করে দিলেন! চারটে বছর ধরে গ্রামের মানুষের কাছে বারে বারে একই আক্ষেপের কথা শুনেছেন, ক্ষেপা স্বামী। সংসার হল না। জীবনটা নষ্ট হল। ছেলেপুলে হবে না। বাঁজা রমণীর ধর্ম-কর্মে অধিকার নেই। পুজোর জোগাড় দিতে পারবে না। শ্যামাসুন্দরী! তুমি করলে কি। মেয়েটার সর্বনাশ! মা ত কোনো উত্তর না দিয়ে ঘোমটাটি সামান্য সরিয়ে অর্থবোধক মৃদু হাসতে পারতেন। প্রায় চারদিনের হাঁটা পথ, শেষের কিছুটা নৌকোয় পেরিয়ে, জ্বর গায়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। পিতার সঙ্গে। তন্ত্রসাধন শেষ করে ঠাকুর ভৈরবী মা ও ভাগিনেয় হৃদয়কে নিয়ে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। একটানা সাত মাস ছিলেন। মা সারদা সংবাদ পেয়ে চলে এসেছিলেন। মা তখন ষোড়শী। ঠাকুর তাঁকে নিজের শয্যায় শয়নের অধিকার দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ, আত্মীয়-স্বজন নিশ্চিন্ত। যাক বাবা খেপা মানুষটি সংসারী হল! শ্রীরামকৃষ্ণকে কে চিনবে? জহুরীই জহর চেনে। বামুনের ছেলে। কলকাতার এক ধনী কৈবর্ত (আসলে মাহিষ্য), দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে কালীমন্দির করেছে। সেই মন্দিরের পুরুত। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভূতিসম্পন্ন সিদ্ধ তান্ত্রিক। শ্রীরামকৃষ্ণ গেরুয়া ধারণ না করলেও ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসী। তাঁর ঘন ঘন সমাধি হয়। গ্রামের মানুষ, আত্মীয়-স্বজন এ-সবের কী বোঝেন! তাঁরা বোঝেন কলাটা-মূলোটা। ভৈরবীও বুঝতে পারলেন না। চোখের সামনে যোষিৎ সঙ্গে শিষ্যের পতন দেখতে পারবেন না বলে কামারপুকুর ছেড়ে চলে গেলেন অনিশ্চিত গন্তব্যে।

শাস্ত্রবিদ, জ্ঞানী তন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসিনী ভৈরবী তাঁর একনম্বর শিষ্যকে কেন ভুল বুঝলেন! তন্ত্রসাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতায় তিনি বিমুগ্ধা হয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে বিচারসভা বসল। একবাক্যে সিদ্ধান্ত হল শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। আবার এও বললেন, এবার 'নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।' তাঁর হলটা কী? বিশ্রী

একটা কাণ্ড ঘটিয়ে, অপমানিত ও প্রহৃত হয়ে তিনি অদৃশ্য হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব দর্শক। তাঁর সামনে তিন রমণী—মা, গুরু ও স্ত্রী। তিনজনই নারী। সব ছত্রাকার হল কেন। পরিমণ্ডল রইল না কেন? ঈর্ষা। ইংরেজি করতেই হবে, কারণ এটি মনস্তত্ত্বের বিষয়। ইংরেজিটি হল, Gender jelousy। এই পরিস্থিতিতে ঠাকুরের সন্ন্যাস গুরু থাকলে অবশ্যই অন্যরকম ব্যবহার করতেন। তিনি ত বলেইছিলেন, বিবাহ করেছ ত কী হয়েছে! মুখের কথা নয়, সত্যই তুমি সংযমী হতে পেরেছ কি না বাস্তবে তার পরীক্ষা হবে। রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখছেন, 'শ্রীমায়ের ভৈবরীর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব না থাকিলেও তাঁহার সহিত ঠাকুরের সহজ মিলনকে ভৈরবী কতকটা ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগলেন। বহু পরিবারেই বধূ ও শ্বশ্রুর এই অবাঞ্ছিত সম্বন্ধ পারিবারিক জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে।' ঈর্ষা কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পত্তি। আমার অধিকার। সে অধিকারে হাত দেওয়া চলবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সহধর্মিনীকে আদর্শ রমণী করতে চান; কারণ তিনি পরবর্তীকালে আদর্শ নারী তৈরি করবেন, যাঁরা স্বামী, পুত্র, কন্যা, শ্বশুর, শাশুড়িকে নিয়ে সুখে সংসার জীবন যাপন করবেন। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সহমর্মিতা না থাকলে, ত্যাগ ও ভালবাসা না থাকলে তা সম্ভব নয়। ঠাকুর জীবনে যা করেছেন সবই শিক্ষার জন্যে। উদাহরণ। এই ঘটনায় মা শিখলেন ঈর্ষা ভাল নয়, অধিকারবোধের সীমা থাকা চাই। কর্তৃত্ববোধ ক্ষতিকারক। মা দেখলেন, মা বুঝলেন। এটাও বুঝলেন, ঠাকুরের ওপর কতটা তাঁর অধিকার। পরে ঠাকুরের মুখে শুনবেন, ঈশ্বর সবেতেই আছেন, ঈশ্বরে কিছু নেই। তাঁর স্বামী স্বয়ং ভগবান। দক্ষিণেশ্বরের জীবনে যা ঘটবে তা হল, দু'জনের অবস্থানের ব্যবধান মাত্র পঞ্চাশ হাত, তবু কখনো কখনো ছ'মাসেও হয়ত একদিন দেখা নেই। অথচ পরস্পরের ওপর পরস্পরের কি নির্ভরতা! মা বলছেন, 'কখনো কখনো হয়ত দু'মাসেও একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, মন, তুই কি এমন ভাগ্য করেছিস যে রোজ ওঁর দর্শন পাবি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে কীর্তনের আখর শুনতুম, পায়ে বাত ধরে গেল।' তিনি বলতেন, 'বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন রাখলে বেতে যায়, মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবে।' রাত চারটেয় নাইতুম। দিনের বেলা বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাহলে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (বয়স তখন উনিশ। ঠাকুরের বয়স সাঁইত্রিশ) নহবতের নিচের একটুখানি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা।' এ কি! এ যে বন্দী নারীর চিত্র। ঠাকুর নিজেই বলছেন, খাঁচার পাখি। এ বন্ধন নয়, মনের মুক্তির পথ। সাধু হব, গৃহ ছাড়ব বললে, ঠাকুর বলতেন, কোথায় ঘুরে ঘুরে মরবে, পথে পথে ভিক্ষে করবে। গৃহদুর্গে বসেই ত ভাল সাধন করা যায়। মনটা ঈশ্বরকে দিয়ে রাখা। বহুদকের বদলে কুটিচক হও। পাখির মা ডিমে তা দেয়। ফুটে বেরোয় বাচ্চা। ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার তাপে তাঁর নিজের নারীরূপ তৈরি করছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি। পাওয়ার হাউস। সেই সময় নহবতের দেয়ালে আঙুল ঠেকালে, আঙুলে ছ্যাঁকা লাগত। অন্ধকারে আলো ছাড়াই আলোকিত—সারদালোক। শ্রীরামকৃষ্ণের আলোর রিফ্লেকটার মা সারদা। ঠাকুর একটি ঘট ভরছিলেন। মা বলছেন আনন্দের পূর্ণঘট আমার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

কামারপুকুরের শয্যা তান্ত্রিক ঠাকুরের সাধন-ভূমি। তোতাপুরীর সাধনের পরীক্ষাভূমি। গীতার জ্ঞানযোগ, সর্বানি ইন্দ্রিয় কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে/আত্মসংযম যোগ অগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।। কামারপুকুরের শয্যা উভয়ের যজ্ঞস্থল-নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে জীবাত্মাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আহুতিদান। সংযম-অগ্নি সাতটি মাস জ্বলে রইল। বাইবেলের Song of solomon-এ আছে, Set me as a seal upon thy heart, as a seal upon they arm, for love is strong as death. স্বামীজী ত সব দেখে, শুনে, বুঝে, সঙ্গ করে একটি কথাই সোনার অক্ষরে লি৻ ে গেলেন—Love personified. মা সারদা ঠাকুরের সংসার। ঘটি, বাটি, কাঁথা, কম্বল নয়। শুধু মা। বিষয়ও মা নির্বিষয়ও মা। গৌরী মা একেবারে পাশে থেকে দেখেছেন, বলছেন, দু-জনে ভাবই ছিল কত! একবার মায়ের মাথা ধরল। ঠাকুরের কী উদ্বেগ! বার বার রামলাল দাদাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'ওরে রামলাল মাথা ধরল কেন!' রামকৃষ্ণ সাধন সরোবরে একটি পদ্ম। তার পাশে একটি কুঁড়ি। সেই কুঁড়িটিকে ফোটাতে হবে। আবার সাজাতেও হবে। সারদা সাজতে ভালবাসে। গয়না গড়িয়ে দিলেন। কত চিন্তা! একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'বিকেলে কখানা রুটি খাও?' মা লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলেন, খাবার কথা কী করে বলেন! এদিকে বিরতি নেই ঠাকুরের প্রশ্নের। তখন তিনি বললেন, 'এই পাঁচ, ছখানা খাই।' এই প্রশ্নের আগে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমার ক-টাকা হলে হাত-খরচ চলে?' মা বলেছিলেন, 'এই পাঁচ-ছ টাকা।' পাঁচ-ছখানা রুটি! ঠাকুর মনে মনে কি হিসেব করলেন, করে বললেন, 'তাহলে পাঁচ-ছ-টাকায় তোমার খুব চলে যাবে।' এর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কী করলেন! বলরামবাবুর কাছে পরিমাণমতো কিছু টাকা গচ্ছিত করে দিলেন। বলরামবাবু ওই টাকা তাঁর জমিদারিতে খাটিয়ে ছ'মাস অন্তর তিরিশ টাকা সুদ শ্রীমাকে পাঠিয়ে দিতেন। একালের পরিভাষায় ঠাকুর একটি বন্ড কিনলেন। বছরে যার সুদ বারো টাকা।

কামারপুকুরে সাত মাস কিশোরী সারদা, (বয়েস ১৫) গুরুগৃহে বাস করে গেলেন। ঠাকুরের শিক্ষা, প্রদীপের সলতেটি কীভাবে রাখতে হবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে। গৃহস্থালির যাবতীয় কাজকর্ম কীভাবে করা উচিত, দেব-দ্বিজ-অতিথিসেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা, সেবা। শেখালেন উচ্চ ধর্মজীবন লাভের জন্যে

চরিত্রগঠন। শেখালেন—যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন। এই নীতির ওপর নির্ভর করে লোকব্যবহার, পরিবারে প্রত্যেকের রুচি. স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী তার সঙ্গে আদানপ্রদান। নৌকো অথবা গাড়িতে যাবার সময় জিনিসপত্র সম্পর্কে সতর্কতা। এই সব উপদেশের সঙ্গে যুক্ত হল ওজন, কীর্তন, ধ্যান। সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা।

মা বলছেন, এই সময় থেকে কেবলই অনুভব করতুম হৃদয়মাঝে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রয়েছে। আদর্শ নারীজীবন গঠনের এই হল 'সিলেবাস'। ঠাকুর মাকে শেখালেন, মনেতেই সব, মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ। মানুষ নিজের মনটি আগে দোষী করে নিয়ে তবে পরের দোষ দেখে।

'এ আর কী করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।' সেইভাবেই ঠাকুর তাঁর শক্তির দিব্য আধার মা-সারদাকে গঠন করার উদ্যোগ নিলেন। মা হবেন 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটার'। স্বামীজীব জ্যান্ত দুর্গা। মহা সন্ধিপূজার জন্যে সকলকে কোমর বাঁধতে বলছেন। স্বামীজী যেন অগ্নি উদ্গীরণ করছেন—'ভায়া যীশুখ্রীষ্টকে জেলে-মালায় ভগবান বলেছিল। পণ্ডিতেরা মেরে ফেললে, বুদ্ধকে বেনে-রাখাল তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায় নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত, ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে। হাজাব হাজার বৎসর পূর্বে তাঁদের (কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট) দু-দশটি কথা পুঁথিতে আছে মাত্র। 'যার সঙ্গে ঘর করিনি, সেই ঘর ঘরণী এ যে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও তাঁদের চেয়ে ঢের বড় ব'লে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বুঝতে পারো ভায়া?' এর পরেই স্বামীজী বলছেন—'মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারোনি, ক্রমে পারবে।' স্বামীজী বলছেন, 'শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না।' স্বামীজী শক্তি আর মহাশক্তি দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ঠাকুরের শক্তি মা সারদা। মা এসেছেন মহাশক্তি জাগাতে। সমস্ত ব্যাপারের একটা শেষ পরিণতি থাকে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'এন্ড রেজাল্ট'। ঠাকুর এলেন, মা এলেন। ঠাকুর সরে এলেন বুদ্ধিজীবীদের 'থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক' মনন কেন্দ্রে। স্বামীজী যাঁদের বলছেন ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মদত্যি। এসে দেখছেন সমাজ ঝাঁটাবার কাজ শুরু হয়েছে। যে সমাজ নারীজীবনের বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে। স্বামীর চিতায় সতীকে বেঁধে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। মহা পুণ্য। জীবন্ত দগ্ধ কন্যা স্বর্গবাস করবেন—কত বছর—না মানুষের দেহে যত রোমকূপ আছে তত বছর। কোথায় পেলেন এই বৃত্তান্ত অপূর্ব। পরাশর সংহিতায়। সাড়ে তিন কোটি লোম আছে মানবদেহে—তাবৎকাল বস্যে স্বর্গে ভর্তারং সানুগচ্ছতি। রামমোহন রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় বউদি অলকমঞ্জরী তাঁর দাদার চিতা প্রদক্ষিণ করছেন। এক পুরোহিত একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে ভাল ভাল কথা বলছেন। অলকমঞ্জরী চিতায় উঠছেন। নির্দেশ এল স্বামীর মাথা কোলে

তুলে দাও। জগমোহনের মাথাটি কোলে তুলে নাও। এইবার সতীর হাতে একটি আম্রপল্লব ধরিয়ে দাও। অলকমঞ্জরী মরতে ভয় পেও না। সাড়ে তিন কোটি বছর স্বামীর সঙ্গে স্বর্গবাস। মুখে হাসি আন। পল্লবটি নাড়াতে থাক। দাও আগুন, বাজাও বাজনা। রামমোহন বউদির চিতা ছুঁয়ে শপথ নিলেন 'তোমাদের আমি দেখে নেব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই আগুন থেকে আর একটি আগুন সরিয়ে আনলেন। যে আগুন বাইরে দেখা যায় না। মৃদু-মন্দ সেই আঁচে চিরকাল ঘরে ঘরে নারীরা দগ্ধ হয় এবং হবে। সেই আগুনের যত স্ফুলিঙ্গে যত রকমের অপরাধ। চড়া সভ্যতার চওড়া পুরুষরা নারীর আধুনিক নাম দেবে সেক্স। সভ্যতার ইতিহাস একটা 'ওয়াটার শেড' বা আল খুঁজে পেয়েছে। সর্ব অর্থে স্বাধীন নারীরা কেমন করে পুরুষের লোফালুফির বস্তু হল। আদিমানব যবে থেকে শিকার ছেড়ে কৃষিতে প্রবেশ করল। জমি, জরু আর গরু পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল অস্ত্র, শস্ত্র, অশ্ব, গজ, যুদ্ধ। শুধু রাজ্য জয় নয়। সোনা-দানা লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠিত হল নারী। তৈরি হল হারেম। নারী ব্যক্তি ভোগ্যা। নারী রাজভোগ্যা। এল বাই নাচ, সুরাপান। পাশাপাশি দেহ ব্যবসা। বধূ হবেন বার বধূ। আর এক ধরনের সতীদাহ ব্রতের রূপ নিল জহরব্রত। ইজ্জত রক্ষার জন্যে আগুনে ঝাঁপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, আমি পুরুষদের দিকটা দেখছি। সারদা, তুমি মাথায় ঘোমটা টেনে নিঃশব্দে নারীদের দিকে ঢুকে যাও। নারীর জগৎ তোমার জগৎ। নারীর ওই অপবাদ ঘোচাও, 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী।' মা হয়ে অনেক অনেক মা তৈরি কর। অনেক মায়ের শক্তি একত্রিত হয়ে মহাশক্তি হবে। জ্যান্ত দুর্গা। মহাদুর্গা মহা সরস্বতী। মহাকালী। তরতাজা, সত্যনিষ্ঠ, ত্যাগী যুবক চাই। নারীত্বের মহিমায় অভিষিক্ত নারী চাই। নরেন্দ্রনাথের স্বপ্নের ভারত তৈরির কাজে লাগবে। সারদা তুমি মা হয়ে ঢুকে পড় পরিবারে পরিবারে। উঁচু দিকে যাও, নিচু দিকে যাও। ফিরিয়ে দাও নারীর লুণ্ঠিত সম্পদ। বুঝিয়ে দাও নারী অবলা নয়, সবলা। শক্তি নিয়ে খেলা। সাবধান। বিদ্যাশক্তি চাই। তা না হলে ভাঙবে। গড়বে না কিছুই। সংসার হল স্টেপিং স্টোন। ভাঙা সংসার থেকে ভাঙা ছাঁচ থেকে ত্রিভঙ্গ সন্তান বেরোয়।

বিদ্যাসাগর বেরিয়ে এলেন বাল্য বিধবাদের চোখের জল মোছাতে। কাশী ভর, বৃন্দাবন ভর—চলবে না। মায়েদের ধর্মের নামে জাঙ্কইয়ার্ডে পাঠানো চলবে না। পরোক্ষ পাপ ব্যবসার মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'পুণ্যনামা বেণ্টিঙ্কের বহু চেষ্টায় ভারতে অবলাজাতির জীবন্ত চিতানল নির্বাপিত হইল বটে, তৎপরিবর্তে তুষানলের সৃষ্টি হইল। দুষ্কর ব্রহ্মচর্য আসিয়া পূর্ণমাত্রায় সতীদাহের স্থান অধিকার করিল। অনল আকারান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহের পরিবর্তে হৃদয় দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বালিকা, বৈধব্যের সূচনা হইতে জীবনের শেষদিন, রেণু রেণু করিয়া দগ্ধ হইতে লাগিল।

সতীদাহ একদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যাপার শেষ হইত, এ আর চীর জীবনেও ফুরায় না।

রামমোহন বউদির চিতার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, হিন্দুধর্মের শাস্ত্রকার পণ্ডিতদের উল্লাস তিনি বন্ধ করবেন, বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের সহযোগিতায় সতীদাহ বন্ধ হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্রও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিধবাদের পুনর্বিবাহ তিনি সম্ভব করবেন।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র যখন বেদান্ত শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় তাঁর অধ্যাপক ছিলেন। একেবারে স্থবির। স্থান, আহার, আচমান, শৌচ, সবই করিয়ে দিতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র দুহাতে তাঁর সেবা করতেন। অধ্যাপক মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। বাচস্পতিমশাই ছাতুবাবু লাটুবাবুদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা পরামর্শ দিলেন। বাচস্পতিমশাই আপনি আবার দার পরিগ্রহ করুন। ঈশ্বরচন্দ্রের পরামর্শ ছাড়া বাচস্পতিমশাই কিছু করতেন না। তিনি এই ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তীব্র ভাষায় বললেন, 'আজ বাদে কাল আপনি মারা যাবেন। বিয়ে করে একটি নিরপরাধ বালিকাকে চিরদুঃখিনী করবেন না। এ এক মহাপাপ।' তিনি শুনলেন না। ছাতুবাবু-লাটুবাবু আর নড়াইলের প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু রামরতন রায়ের উদ্যোগে বারাসতবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পরমাসুন্দরী বালিকার সঙ্গে বাচস্পতি মশাইয়ের বিবাহ হল।

একদিন বাচস্পতিমশাই ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন, 'ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিনও দেখতে গেলে না!' অধ্যাপক মহাশয় একদিন জোর করে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজ থেকে নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বালিকার পায়ের কাছে দুটি টাকা রেখে উদ্দেশে প্রণাম করে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় হাত চেপে ধরলেন। দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে বললেন। সেই মুখ দর্শন করে ঈশ্বরচন্দ্র হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। বাচস্পতিমশাই 'অকল্যাণ করিস না রে'—বলে ঈশ্বরচন্দ্রকে বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। প্রচুর শাস্ত্রীয় উপদেশ দিয়ে ছাত্রকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, বাবা। একটু মিষ্টিমুখ কর। ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, 'এ ভিটায় আর কখনো জলস্পর্শ করব না।' এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই বাচস্পতি মহাশয় মারা গেলেন।

'বাল্য বৈধব্যের' ভয়ঙ্কর চিত্র যুবক ঈশ্বরচন্দ্রকে ভয়ঙ্কর বিচলিত করেছিল। ছাত্রাবস্থায় দেশের বাড়িতে গিয়ে, বিধবা কন্যাদের হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনতেন। একই পরিবারে পিতা মাতা, ভাই-ভাইয়ের স্ত্রীরা পরিপূর্ণ ভোগের জীবন যাপন করছে। বিধবা কন্যাটি উপবাসে শীর্ণ। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি-বিধানে নিষ্পেষিত। সামান্য পদস্খলনে গর্ভবতী কন্যা পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন—'রাক্ষসী গৃহিণী সূতিকা-গৃহে স্বহস্তে সেই নিরপরাধ শিশুকে টিপিয়া মারিয়া ফেলিল।'

দায়ী কে? বাচস্পতি মহাশয়দের ন্যায় শ্রদ্ধেয় অপরিণামদর্শী কিছু ব্রাহ্মণ। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ কণ্ঠে গলকম্বলের মতো ঝুলছে। হৃদয়ে পাষাণ। সুপ্রবীণ পিতা নিজের অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার বৈধব্যানুষ্ঠানের বিষাদরাশির মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে পাইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। কোমলপ্রাণা কন্যা ও ভগিনীকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কি এইরূপই হইবে।

ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে যা খুঁজছেন তা পেয়ে অধীর আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'পেয়েছি পেয়েছি।' স্থান, সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগার। সময় শেষরাত। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র আহার-নিদ্রা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'শাস্ত্রার্থ উদ্ধার করা, বোধহয় রাবণের প্রহরিবেষ্টিত অশোককাননবাসিনী সীতার উদ্ধারসাধন অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার।' সবে ভোর হচ্ছে। গ্রন্থাগারের জানলা গলে ভোরের আলো এসেছে। কীটদষ্ট পুঁথির পাতা থেকে ঈশ্বরচন্দ্র সেই শ্লোকটি তুলে নিচ্ছেন, যে-যুদ্ধ শুরু করতে চলেছেন, সেই যুদ্ধের অস্ত্র। পুঁথিটির নাম 'পরাশর সংহিতা'। ভারতচূড়ামণি মহাত্মা ব্যাসদেব পরাশর সংহিতাকেই কলিযুগের সহজ ধর্মপালনের প্রধান সহায় বলে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র পরাশর সংহিতায় এই মন্ত্রটি পেলেন, 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।' ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র প্রকাশ করলেন 'বিধবা বিবাহ'। ঐতিহাসিক লিখছেন, 'উক্ত গ্রন্থ প্রচার করিবামাত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। সৈন্যসহ নেপোলিয়নের বিচরণে সমগ্র ইউরোপ যেমন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সমগ্র ভারতবর্ষও সেইরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সংস্কার সংগ্রামে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল।'

এই ১৮৫৩ সালের, ২২ ডিসেম্বর মা সারদা পৃথিবীতে এলেন। আর ১৭ বছরের ঠাকুর এলেন কলকাতার ঝামাপুকুরে, দাদার হতে ধরে। ইংরেজের ইংরিজি শাসন বহাল হয়েছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত নতুন এক কালবিভাগ করে গেছেন—প্রথম, বৈদিকযুগ। দ্বিতীয়, মহাকাব্য যুগ। তৃতীয়, দার্শনিক যুগ। চতুর্থ, বৌদ্ধযুগ। পঞ্চম, পৌরাণিক যুগ। ষষ্ঠ, রামমোহন রায় যুগ। রামমোহন বর্তমান যুগের জন্মদাতা। ১৮২৩ সালে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে যে চিঠি লেখেন তাকেই 'এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে।' রামমোহন লিখলেন, আপনারা সেই ব্যবস্থা করুন employing European gentlemen of talent and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

ডেভিড হেয়ার, স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট আর রামমোহন রায় এই তিনজনের

উৎসাহে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হল। সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর হিন্দু কলেজের নামে নিখাত হল ১৮২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। একটা জাগরণের সূচনা। অচলতায় সচলতা। একদিকে পাথর সরানোর কাজ, অন্যদিকে প্রস্রবণ উন্মোচনের কাজ। আধুনিক ধারায় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, অন্যদিকে কুসংস্কারের চক্রান্ত থেকে জাতিকে উদ্ধার। আমরা এই কালকে বলছি 'রেনেসাঁ।' আর একভাবে বলতে পারি, 'ইয়ারস অফ লাইটনিং ডে অফ ড্রামস'। দামামা বেজেছে। যুক্তি তেড়ে আসছে সংস্কারের দিকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে কেন পুড়িয়ে মারা হবে। কেন বালবিধবারা শুষ্ক কণ্ঠে ভূমিতে ছটফট করবে। ওধারে কচি পাঁঠার গা-মাখা ঝোল। এদিকে নির্জলা উপবাস। মেয়েরা কেন লেখাপড়া শিখতে পারবে না। পূজার জোগাড় করতে পারবে, পুরোহিত হতে পারবে না। ওঁঙ্কারে অধিকাব নেই। পুরুষের তৈবি শাস্ত্রে মেয়েদের শাসন। সব চুরমার করে দাও।

শ্রীরামকৃষ্ণ কম্পমান কলকাতায়। মা সারদা শান্ত জয়রামাবটীতে। মা এসবের সঙ্গে তাঁরা কেউই সেভাবে জড়িত নন। কিন্তু কী হচ্ছিল তখন। ঝোড়ো বাতাস বইছিল কীভাবে। ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল কীভাবে? '১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব অগ্রসর হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের নবোন্মেষিত জাতীয় চেতনার ধর্মীয় রূপ।' জোড়াসাঁকোয় চিৎপুর রোডের উপর রামলোচন বসুর একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে রামমোহন রায় স্থাপন করনে উপাসনা সভা। সাল, ১৮২৮, ৬ ভাদ্র। প্রথমে নাম হল 'ব্রহ্মসমাজ', পরে পবিচিত হল 'ব্রাহ্মসমাজ'। ঠাকুর পৃথিবীর মঞ্চে প্রবেশ করছেন আরও আট বছর পরে। আর ১৮৭৫, ১৫ মার্চ বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। ২৮ মার্চ কেশবচন্দ্র 'ইন্ডিয়ান মিররে' তাঁর সম্পর্কে লিখবেন। 'দর্শন করিয়াছি। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার কথার মাঝে ব্যবহৃত নিরবচ্ছিন্ন উপমা ও রূপক যেমন সুসঙ্গত তেমনি সুন্দর।'

১৮৫৫ সালের ৩১মে, রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠা করলেন মা ভবতারিণীর মন্দির। দাদার সঙ্গে ঠাকুর এলেন দক্ষিণেশ্বরে। দাদা পুরোহিত, ঠাকুর হলেন মায়ের বেশকারী। দাদা রামকুমারের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি। কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ঠাকুর হলেন পূজারী। ১৮৫৬ সালে রামকুমারের পরলোক গমন। ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থা।

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে শুরু হল সিপাহী মঙ্গলপাণ্ডের বিদ্রোহ। ৮ এপ্রিল তড়িঘড়ি মঙ্গলপাণ্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হল। ১০ মে শুরু হল সিপাহী বিদ্রোহ। ১১ আগস্ট খবর এল কলকাতা আক্রান্ত হতে পারে। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন, 'তোমরা জান না বোধহয় যে এই বিধবা বিবাহ প্রচলন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। শুধু দাঁত দিয়ে

টোটা কাটা নয়, বিধবাদের বিয়ে দিয়ে ইংরেজ হিন্দুদের সর্বনাশ করছে এইরকম একটা রব উঠেছিল।' কলকাতায় 'সাজ সাজ রব'। প্রায় সব সরকারী বাড়িতে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের বাড়ি সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দিতে বলা হয় অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রকে। তারিখ ১১ আগস্ট, ১৮৫৭ সাল। ঈশ্বরচন্দ্র আপত্তি জানিয়ে চিঠি দিলেন। ১৩ তারিখে কলকাতায় এলেন সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল। ১৭ তারিখে ভাইসরয় ঈশ্বরচন্দ্রের ১১ তারিখের চিঠির উত্তরে জানালেন, কলেজের বাড়ি সাময়িক অধিগ্রহণের নির্দেশ তিনিই জারি করেছেন; অতএব কালবিলম্ব না করে ঈশ্বরচন্দ্র যেন বাড়ি গ্যারিসন কম্যান্ডারের হাতে তুলে দেন।

কলকাতার এমত উদ্বেল সময়ে কলকাতা থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা চলছে। সাধারণ মানুষের ধারণা, তিনি উন্মাদ হয়েছেন। চিকিৎসা করেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ। জয়রামবাটীতে সারদা মায়ের বয়স মাত্র চারবছর। হঠাৎ খবর এল বিদ্রোহী সিপাহীরা কলকাতা আক্রমণ করতে আসছে। উত্তরভারত বিদ্রোহীদের দখলে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফৈজাবাদের মৌলবী, বিঠুরের নানাসাহেব, ঝাঁসির রানী, নানাসাহেবের সেনাপতি তাঁতিয়া টোপী। বিদ্রোহীদের দখলে দিল্লি। বাহাদুর শাকে আবার সিংহাসনে বসানো হয়েছে।

খবর এল এইবার কলকাতা। বহু ইংরেজ কেল্লার ভেতরে আশ্রয় নিয়েছেন। ইংরাজ ফিরিঙ্গি দেশীয় খ্রিস্টানরা সদা সর্বদা অস্ত্র নিয়ে ঘুরছেন। সন্ধের পর বাজার-দোকান সব বন্ধ। রাস্তাঘাট জনশূন্য। বিদ্রোহীরা এগিয়ে এসেছে। ভারত আবার স্বাধীন হবে।

'মা দেখা দে!' পঞ্চবটীর কান্না। 'শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দে মা। আমরা অমৃতের সন্তান।' সংঘাতের স্বাধীনতা নয়। জীবকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যেখানে 'পরাধীনতা' শব্দটি অচল। আত্মার স্বাধীনতা। 'দেখা দে। দেখিয়ে দে।' সেনাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ। 'ওয়ান ম্যান ব্রিগেড।' পঞ্চবটীর ক্যান্টনমেন্টে। কাঁধে বাঁশ নিয়ে মার্চ করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'আয় মা সাধন সমরে।' বিপরীত মেরুতে কেশবচন্দ্র নবীন উদ্যমে সাধন শুরু করেছেন। ব্রহ্মকে অঙ্গভূষণ নয় অন্তর্ভূষণ করতে হবে। ব্রহ্মকে লাভ না করে ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। একজন পাথরকে জাগাবার জন্যে পাথরে মাথা ঠুকছেন, আর একজন সাকারে বসে নিরাকারের হাত ধরতে চাইছেন। চারপাশ দিয়ে মহাকল্লরবে বয়ে চলেছে জগৎ স্রোত। শক্তির সংঘাত।

আদিকে ব্রহ্ম, অনাদিতে ব্রহ্ম। শক্তির স্ফুট এই জগৎ দৃশ্য। বৃহৎ আমির ইচ্ছায় বুদ্বুদ ফুটছে ফাটছে। শক্তির সন্ধান, ধারণ, বিতরণ। আত্মশক্তির পাওয়ার হাউসের ঢাকনা খুলতে হবে। স্বচক্ষে দেখতে হবে—ব্রহ্মের চৈতন্যে জগৎ কেমনভাবে আছে।

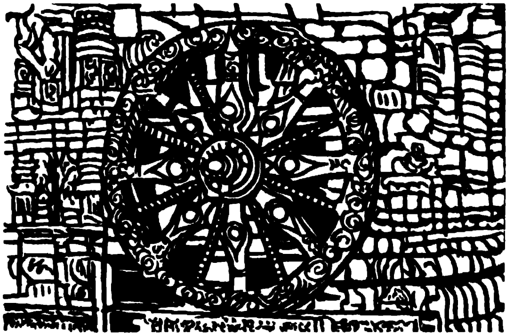
ওদিকে সমাজ সংস্কার, আন্দোলন চলছে চলুক। এদিকে খুলে দেওয়া যাক আত্মজাগরণের পথ। পৃথিবী যত বড়ই হোক, অনন্তের আকাশে ছোট্ট একটি বিন্দু।

অসীমের দৃষ্টিতে তাকালে 'আছে কি নেই।' শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ খুঁজে পেলেন সেই সেতু পথ। 'এই আছি এই নেই।' নিজের সম্পর্কে রসিকতা করে বললেন, 'দিনের মধ্যে সাতবার বাঁচে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ একটা শক্তিকুণ্ড তৈরি করতে চাইলেন। করলেনও। কেউ পরাধীন নয়। সবাই স্বাধীন। আত্মার কোনো বন্ধন নেই। তুমি তোমার মন দিয়ে নিজেকে বেঁধেছ। মায়ার বন্ধন, মোহের বন্ধন, ভয়ের বন্ধন। কিসের পাপ, কিসের পুণ্য। নেই, নেই বোলো না। বলো আছে আছে। আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। চিদানন্দ সিন্ধু তীরে আমার অবস্থান। যেথা বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেছে নিলেন ভাবান্দোলনের পথ। তুমিও এসো, তুমিও এসো। কল্পনার চোখে বেশ দেখতে পাই, একটা গাড়ি চলছে কালের পথ ধরে, যে পথ চলে গেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। চালকের আসনে স্বামী বিবেকানন্দ। পেছনের আসনের ডান দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, বাঁ দিকে মা সারদা। মুখ দুটি বেরিয়ে আছে। লোকারণ্য জনপদের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছে। প্রেমধন বিলায় গোরা রায়।' এই গানটি গাইছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসের এক দুপুরে নরেন্দ্রনাথ, শরৎমহারাজ আর শশীমহারাজ হেদুয়ায় বসে আছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ তখন রামকৃষ্ণময়। প্রেমের নিগড়ে বাঁধা পড়েছেন। নরেন্দ্রনাথ গাইছেন—'প্রেমধন বিলায় গোরা রায়। গান শেষ হল। গভীর ভাবস্থ নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলছেন, 'সত্য সত্যই বিলাচ্ছেন। প্রেম বল, ভক্তি বল. জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায়, যাকে যা ইচ্ছা তাকে তাই-ই বিলাচ্ছেন। কি অদ্ভুত শক্তি।'

পেছনের আসন থেকে মা সারদা চালক নরেন্দ্রনাথকে বলছেন, 'নরেন চলো, ঠাকুরকে নিয়ে আমরা আমেরিকা যাই।'



গৃহী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদেব জন্যেই এসেছিলেন। অবশ্যই। তিনি ছিলেন মানুষের কারবারী। মানুষ আমার বিষয়। চতুর্দিকে পোকার মতো মানুষ কিলবিল করছে। 'পোকা' শব্দটির নিষ্ঠুর প্রয়োগ। বললেন না 'অমৃতের পুত্র'। বললেন, মানবজন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরলাভ। বললেন, এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান।

জানোয়ার থেকে জান্তা হতে হবে। তোমার স্রষ্টা তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুর এক রসিকতা করেছেন। স্বরূপ ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। ফিতে মাপা দুটি পিল্লে জন্ম আর মৃত্যু। মায়া দিয়ে ঘেরা। কখনো সুন্দরী, কখনো পিশাচী। সবাই ভেল্কিই দেখতে চায়, জাদুকরকে কেউ দেখতে চায় না।

আমিই সেই, আমিই ব্রহ্ম একথা তুমি তখনই বলতে পারবে যখন তোমার আমি বোধটা থাকবে না। আমি-আমার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তুমি মায়ার বশ। আর কলির মায়া হল, কাম কাঞ্চন। হবেক রকমের বাসনা। নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারবে। দুনিয়া জোড়া তাণ্ডব—বিষয় আর বিষয়ী এই হল সার্কাস।

তাই যদি হবে, এইটাই যদি আমাদের ভাগ্যের লিখন হয়, তাহলে তিনি কষ্ট করে দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেন কেন! শরীর পাত করা সাধন করলেন কেন! দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পঞ্চাশ বছরের জীর্ণ শরীরখানি যখন ছেড়ে গেলেন, তখন হাড়ের খাঁচাটি ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁর দেহাবসানের চার বছর পরে, ১৮৯০ সালে নরেন্দ্রনাথ তাঁর পরমসুহৃদ কাশীর জমিদার প্রমদাবাবুকে লিখছেন, 'আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসী তিল দেহ সপর্পিণু' করিয়াছি। তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদ্যপি ৪০ বৎসরযাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া

ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিমান্ হইয়াও অকৃতকার্য হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কী করতে চেয়েছিলেন! উত্তর, স্বামীজি যা করেছেন। যে কর্মপ্রবাহ প্রবাহিত করে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরের দেবভূমি থেকে সামান্য সামান্য সংবাদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসতে লাগল কলকাতার ভোগীসমাজে। মানুষ তৈরি সন্ন্যাসী দেখেছে।

গেরুয়াধারী, মালাধারী। কোনো গেরুয়ায় লালের ভাগ বেশি, কোনো গেরুয়ায় হলুদ বেশি। সন্ন্যাসী তৈরি হওয়াটা তাঁরা দেখেননি। সেটি গুরুশিষ্যের নিভৃত ব্যাপার। সাধারণ মানুষ ধর্মের জগতের যাঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা হলেন পুরোহিত। শাস্ত্র ব্যবসায়ী। গৃহীরা তাঁদের কাছে যজমান। পাওনা-গণ্ডা নিয়ে দরদস্তুর চলে। এঁরা শালগ্রামের অধিকারী। গামছাধারী। পূজার শেষে চাল-কলা বাঁধেন। বগলে ছাতা। শ্রাদ্ধের পাওনা। বিবাহে চার হাত এক করেন। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে মৃতকে পরলোকে পার্সেল করে দেন।

বাংলার বৈষ্ণবকুল তখন প্রবল। ভাগবতাচার্যদের বিশাল দাপট। মহাপ্রভু বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করে দিয়ে গেছেন। ভেকধারী বৈষ্ণবরা 'নাম' নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মন্ত্র হল—নামে রুচি, জীবে দয়া। হরের্নামৈব কেবলং। বালক গদাধর কামারপুকুরের সংসার জীবন দেখছেন, যেন দূর কোনো গ্রহ থেকে বেড়াতে এসেছেন। লাহাবাবুরা সম্পন্ন মানুষ। কামারপুকুরের অগ্নিকোণে পুরী যাওয়ার পথের ধারে জমিদার লাহাবাবুরা যাত্রীদের জন্যে সদাব্রত পান্থশালা নির্মাণ করে রেখেছেন। অতিথিশালার আকর্ষণে বালক ছুটে যেতেন। কোথাও রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। কোথাও ভাগবত। শৈশব স্মৃতির কথা বলছেন, 'বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্যদের শোনাতুম। মেয়েদের ঢঙ বেশ বুঝতে পারতুম! তাদের কথা, সুর নকল করতুম। সাধুরা যা পড়ত, বুঝতে পারতুম। পণ্ডিত এসে সংস্কৃতে কথা কইলে বুঝতে পারতুম।' গান শোনামাত্রই শিখে যেতেন—'ধরো না ধরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে...।' এক এক যাত্রার সমস্ত পালাটাই গেয়ে দিতে পারতুম।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী দেখার অফুরন্ত সুযোগ এগিয়ে দিচ্ছে লাহা জমিদারদের ওই পান্থধাম। রমতা সাধুরা আসছেন, থাকছেন, চলে যাচ্ছেন। আসক্তিহীন মানুষ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু। শাস্ত্র আলোচনা করছেন। ইট সাজিয়ে কাঠের আগুনে যা হয় কিছু ফুটিয়ে নিচ্ছেন। চলে যাওয়ার পর পড়ে থাকছে, পোড়া ইট, কাঠ, ছাই। দেখছেন ধর্মনির্ভর গৃহীদের। ঢং করে পুরাণ পড়ে শোনাচ্ছেন পোড় খাওয়া, পাকা বাঁশ সংসারীদের। প্রণামী ট্যাঁকে পুরে বেরিয়ে পড়ছেন আর এক আসর মাত করতে। এঁদের দেখেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে পেরেছিলেন তাঁর ভক্তদের, এক ভাগবত পাঠক রোজ রাজামশাইকে ভাগবত

শোনান। পড়া শেষ হলে রাজামশাইকে জিজ্ঞেস করেন, রাজামশাই কিছু বুঝলেন?রাজা বলেন, আগে তুমি বোঝো। রোজই এই এক ব্যাপার। ঠাকুর বলছেন, 'লোকটা সাধনভজন করত—ক্রমে চৈতন্য হল। তখন দেখলে যে হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বলতে যে—রাজা, এইবার বুঝেছি।

আর একটি গল্প বলতেন। শুরুতেই বাস্তবদর্শন, 'সংসারী লোকের অবসর কই? একজন একটি ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তার বন্ধু বললে, একটি উত্তম ভাগবতেব পণ্ডিত আছে, কিন্তু তার একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষবাস দেখতে হয়। চারখানা লাঙল, আটটা হেলে গরু। সর্বদা তদারক করতে হয়, অবসর নাই। যার পণ্ডিতের দরকার সে বললে, আমার এমন ভাগবত পণ্ডিতের দরকার নেই। যার অবসব নেই। লাঙল-হেলেগরু-ওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন পণ্ডিত চাই যে আমাকে ভাগবত শোনাতে পারে।'

বলেই বলছেন, 'তবে কি এদের ঘৃণা করি?'

ঘৃণা করবেন কেন? তিনি যদি ঈশ্বর হন, ভগবান হন, তাহলে তিনি এসেছেন তাঁর জমিদারিতে। তিনি সেই স্রষ্টার 'অ্যামবাসাডর'। কিছু ওষুধ-বিষুঁধ নিয়ে এসেছেন। ভবরোগের বৈদ্য তিনি। কখনো মানুষ, কখনো ভগবান। অবতার আর সাধকে এই তফাত। সাধকের গতি একমুখী। তিনি এগোচ্ছেন। ঈশ্বরের দিকে। আর অবতার? তিনি এগোতেও জানেন পেছতেও জানেন। ফোর ডাইমেনসানে তাঁর বিচরণ। কখনো সসীমে, কখনো অসীমে।

ঠাকুর বলছেন, 'তবে কি এদের ঘৃণা করি? না, তখন ব্রহ্মজ্ঞান আনি। তিনিই সব হয়েছেন—সকলেই নারায়ণ। কামারপুকুরে বালক গদাধরের দর্শন ছিল, সিদ্ধান্ত ছিল না। পৃথিবীর নিয়মে বালক ভগবান বালকই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কোনো অলৌকিকত্ব নেই। তিনি পুরাণের চরিত্র নন, ইতিহাসের চরিত্র। বারে বারে বলতেন, আমি তোমাদেরই মতো মানুষ একজন। তোমাদের জীবনের অংশীদার। তোমাদের সঙ্গে আমার সামান্য যে তফাত, তা হল—আমি দেখি, ভেতরে দেখি, বাইরে দেখি। নিরাসক্ত হয়ে দেখি। আমার কাছে একটিই মাত্র অলৌকিক জিনিস আছে—একটি দিব্য চালুনি। মানুষকে চেলে আলাদা করি। মোটা দাগের মানুষ আর সূক্ষ্ম বোধের মানুষকে।

'ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীবজন্তু, গাছপালা আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভাল আছে মন্দ আছে। বাঘের মতো হিংস্র জন্তু আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন আছে; আবার বিষফলও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে; সাধু আছে অসাধুও আছে; সংসারী জীব আছে আবার ভক্ত আছে।'

মানুষের প্রকার আলাদা করছেন। বলছেন চারপ্রকারের মানুষ আছে। বদ্ধজীব,

মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব আর নিত্যজীব। নিত্যজীব পুরাণের চরিত্র, যেমন নারদ। এঁদের ভূমিকা সংসারে থাকেন মানুষের মঙ্গলের জন্যে। শিক্ষা দেবার জন্যে। বদ্ধজীব কী রকম? বিষয় ছাড়া কিছু জানে না। জানতেও চায় না। কে ভগবান? ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। চিন্তা করার দরকার হয় না। সংসারের মতো উত্তেজনা ছেড়ে অদৃশ্য, অলৌকিক ভগবানের জন্যে মাথা খারাপ করার মানে হয় না।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের গায়েই যদু মল্লিকের বাগান। সেখানে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কর্তব্য কি? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কি না?' যতীন্দ্র বললে, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে! রাজা যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন!' তখন আমার বড় রাগ হল। বললুম, 'তুমি কী রকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি—এসব কিছু মনে হয় না!'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিলেন। কামারপুকুর থেকে ঝামাপুকুর। সেকালের বিরাট ধনী রানী রাসমণির দেবালয়ের পূজারী। ঘোরতর বিষয়ীদের আড়তে নিষ্কলুষ এক যুবক। আত্মমগ্ন। পূজাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার কোনো বাসনাই নেই। চালচলন দেখলেই মনে হয় জগৎছাড়া মানুষ। চারপাশে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কেমন। কোনো কোনো কর্মচারী পরদারসেবী। রাতের বেলা তাঁরা অন্যজগতে বিচরণ করেন। কোনো শরিক মন্দিরের আলু, কপি, আনাজপত্র গাড়ি বোঝাই করে বাড়িতে চালান দিচ্ছেন। স্থানীয় মানুষ গঙ্গার ঘাটে এসে তেল মাখতে মাখতে পরচর্চা করছেন। মাঝে মধ্যে বিরাট ঘটা করে উৎসব হচ্ছে। যাত্রা, গান। দক্ষিণেশ্বর থেকে কুটিঘাট পর্যন্ত গঙ্গার তীর আলোর মালায় সজ্জিত হচ্ছে। পরে ভক্তদের বলেছিলেন, 'রাসমণি কালীবাড়ি করেছেন, এই কথাই লোকে বলে। কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন।' জমিদার মথুরবাবু, রানীর সেজ জামাই সেই রকমই তো চান। অর্থ, বিত্ত মানুষকে রজোগুণী করে, অহঙ্কারী করে। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিষ্টি একটি ছেলে। তিনি অন্যান্যদের মতো চাকর নন। ত্রাণকারী পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। তাঁর সুচিন্তিত বিধানের ফলেই মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। তিনি সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়। চালকলা বাঁধা সামান্য পুরুত নন। তাঁর ছোট ভাই শ্রীরামকৃষ্ণ।

সেজবাবুর নজর পড়ল। অনেক লোভী মানুষের সমাবেশে এই নির্লোভ, সুমিষ্ট যুবকটিকে আমার ভাল লেগেছে। শিল্পবোধ আছে। অপূর্ব মূর্তি পড়েছে মহাদেবের। বিষয়ীদের ধারেকাছে সহজে আসে না। গঙ্গার তীর তার বিচরণভূমি। ধুরন্ধর মথুরামোহন। লেঠেল দিয়ে জমিদারি চালান। তাঁর শাশুড়ী, রাসমণি, রানী, আরো বেপরোয়া। ইংরেজদের কাঁপিয়ে দিয়েছেন। সেজবাবু সদ্য যুবক এই ছেলেটিকে

ধরলেন; কিন্তু প্রকৃত কে ধরলেন? ধরলেন, মা কালী! রানী সদলে কাশী যাচ্ছিলেন। প্রথমে ধরা পড়লেন তিনি। কাশী থেকে কালী। এক মতে, নৌকার-বহর দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এসে থেমে পড়ল। রাতের বিশ্রাম। স্বপ্ন। রাসমণি। যাও কোথায়? আমি গঙ্গার তীরে তোমার পূজা গ্রহণ করব। আমাকে প্রতিষ্ঠা করো! 'গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল।' মথুরবাবু বালিতে ভূমি সংগ্রহের চেষ্টা করলেন। বিরোধী ভূস্বামীদের শত্রুতায় জমি পাওয়া গেল না। এর পেছনেও মায়ের হাত। শাস্ত্রসম্মত উপযুক্ত স্থান রয়েছে পূর্বতীরে। শক্তির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান কূর্মপৃষ্ঠ শ্মশান। সুপ্রীমকোর্টের অ্যাটর্নি হেস্টি সাহেবের জমি। একাংশ একটি কুঠি। আর একদিকে মুসলমানদেব কবরডাঙ্গা আর গাজীসাহেবের দরগা। প্রায় ছশো ফুট গঙ্গার দিকের পোস্তার নির্মাণকাজ শেষ হল। সুন্দর ঘাট তৈরি হল। প্রবল বানে সব চুরমার হয়ে গেল। তখন নির্মাণকাজের দায়িত্ব দেওয়া হল সাহেব কোম্পানি 'ম্যাকিন্টশ'কে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অনুসন্ধান ছিল পৃথিবীর এই মায়াভূমিতে—প্রস্তরে কি প্রাণ থাকে। সেই সন্দেহ নিরসন করেই মা আসন নিলেন রৌপ্যসিংহাসনে। মন্দির নির্মাণে বিলম্ব। মূর্তি পাছে ভেঙে যায় তাই প্যাকিং বাক্সে নিরাপদ। অনেকদিন হয়ে গেল। রাতে রানী স্বপ্ন পেলেন, 'আর কতদিন এইভাবে আমাকে আবদ্ধ করে রাখবি? আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে রাসমণি!' প্যাকিং বাক্স খুলে দেখা গেল, মা ঘেমে গেছেন।

জীবন্ত মাকে সাধারণ পূজারী কেমন করে পূজা করবেন। মা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছেন। কেউ জানে না। ক্রমে জানবেন। এমন কাণ্ড ঘটাবেন, যা শুধু ধর্ম নয় ইতিহাস। মথুরবাবু বললেন, 'গদাধর তুমি হবে মায়ের বেশকারী। মাকে মনের মতো করে সাজাবে। গান শোনাবে, কোন হিসাবে হর হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।'

বেশকার থেকে পূজারী। মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে কাতর প্রার্থনা—দেখা দাও। দেখা না দিলে আমি মরে যাব। আমি চুরমার হয়ে যাব। আমি মূর্খ বলে দেখা দিবি না। মা হাসছেন। হাসছিস পাষাণী! তা হলে এই নে। ছাগলের বদলে মানুষ। নরশির। আহা! মা ত! পাথরের মা হলে কী হবে! যত মন্ত্র, যত নিবেদন সব ত জীবন্ত মায়ের কাছে! মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। শ্মশানবাসিনী, মৃত্যুরূপ কালীও আতঙ্কিত। করিস কী, করিস কী। বিচ্ছুরিত আলো। তরঙ্গায়িত জ্যোতিঃ। ঢেউয়ের পর ঢেউ। পেলব পূজারী সংজ্ঞা হারালেন। গর্ভমন্দিরের চৌকাঠ দীর্ণ হল। পূজার যত সামগ্রী মুহূর্তে চৈতন্য লাভ করল। চারপাশ জমজম করে উঠল। সেই গণ্ডির বাইরে সব থমথমে। যে আসে তার বুক কাঁপে। এ প্রাণ প্রতিষ্ঠা সাধারণ পুরোহিতের সাধ্যের বাইরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম ধরা দিলেন এক গৃহীকে। তিনি হলেন স্বয়ং মথুরবাবু। মথুরবাবু এ কী দেখছেন! ছোট ভটচাজ্ কুঠিবাড়ির বারান্দায় পায়চারি করছেন। যখন ওদিকে

যাচ্ছেন শিব। যখন ওদিক থেকে এদিকে আসছেন মা কালী। শিক্ষিত মথুরামোহন। প্রিন্‌স দ্বারকানাথ তাঁর বন্ধু। যুক্তিবাদী-যুগের তরতাজা এক তরুণ। আলৌকিকে অবিশ্বাসী। গদগদ ভক্তি তাঁর নেই। নিশ্চয় দৃষ্টি বিভ্রম! বার বার সেই একই দর্শন! তাহলে ইনি কে? ছুটে গিয়ে পায়ের কাছে নতজানু। পড়ে রইল আরামকেদারা, ফরসির নল। তছনছ হয়ে গেল সম্ভ্রান্তের অহংকার। প্রভুর পদতলে লুটিয়ে দিলেন পদমর্যাদা। 'আমি ধরে ফেলেছি তোমাকে। ছোট ঠাকুর। আর লুকাবি কোথায় মা কালী! আমি তোমার সেবক! আমি জেনেছি, তোমার সেবা করার জন্যেই আমি পৃথিবীতে এসেছি!'

বিজ্ঞান আর ভগবান এই তর্কেরও অবসান। প্রকৃতির নিয়মে জগৎ চলছে। বেনিয়ম হতে পারে না। ভগবানও অসহায়। উনবিংশ শতকের কলকাতায় বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের ঝোড়ো বাতাস বইছে। যুক্তির যুগ। ঈশ্বরও প্রাকৃতিক নিয়মের বশ। কলকাতায় তখন অনেক ইন্টেলেকচুয়াল। অগ্রগণ্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। মথুরবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক। পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক হবেন। ডঃ সরকার বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র সদস্য ছিলেন। শুধু ধর্মচর্চা নয় বিজ্ঞান চর্চাও সমানতালে চলেছে।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে বলে বসলেন, ভগবানও নিয়মের অধীন। নিয়ম বহির্ভূত কাজ তিনিও করতে পারবেন না। তর্কটা এই দাঁড়াল, নিয়মের ভগবান, না ভগবানের নিয়ম! শ্রীরামকৃষ্ণের দৃঢ় বিশ্বাস, সবই মায়ের ইচ্ছা। তিনি মায়ের কোলে বসে আছেন।

মথুরবাবু বললেন, কই দেখি, লাল জবা গাছে তিনি সাদা জবা ফোটান ত! শিব আর কালী দেখেছিলেন, এইবার দেখলেন, একই ডালে লাল আর সাদা জবা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, মায়ের ইচ্ছে হলে তাও হতে পারে। যেদিন তর্ক হলো, তার পরের দিন সকালেই এই ঘটনা। মথুরবাবু স্তম্ভিত।

মায়ের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ জগদগুরু হবেন। তারই প্রকাশ রাসমণিকে শাসন। মন্দিরের কর্মচারীরা আঁতকে উঠলেন। সর্বনাশ! রানীমাকে চড় মেরেছেন। চাকরিটা এইবার গেল! যাও, গাঁয়ে গিয়ে ভিখ মেগে খাও। রানী জপ-আর বিষয়চিন্তা করছিলেন। প্রথম কৃপা তাঁর ওপরেই বর্ষিত হল। মৃদু আঘাতে চমকে উঠলেন। জড়সড় হয়ে গেলেন অপরাধীর মতো। এ ত সাধারণ মানুষ নয়! মন পড়তে পারেন। বই পড়তে না পারলে কী হবে। ঈশ্বরের লেখা এই মানুষটি পড়তে পারেন। মা কালীকে যিনি পেয়েছেন, তিনি ত পঞ্চাশৎ বর্ণমালাও পেয়ে গেছেন। মায়ের গলার মুণ্ডমালায় ঝুলে আছে পঞ্চাশটি বর্ণ। মা যে অনন্তের কেতাব।

মন্দিরের নায়েব, খাজাঞ্চি, কর্মচারী, দক্ষিণেশ্বর গ্রামের অধিবাসী, কেউ চিনল না। চিনলেন তিনজন। মালী ভর্তাভারী, রসিক মেথর আর মন্দিরের পাশে সরকারী

বারুদখানার প্রহরী, সৈন্যবাহিনীর কুঁয়ার সিং।

ধর্মের জগতের স্বাভাবিক নিয়ম-সাধনার পর সিদ্ধি। ইষ্টদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে বিপরীত—আগে সিদ্ধি, তারপর শাস্ত্রধরে সাধন। গুরুব মর্যাদা, গুরুর প্রয়োজন যেন ফুরিয়ে না যায়! মানুষের ছদ্মবেশে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন দক্ষিণেশ্বরে। গুরুরা সেটি না জেনেই পরীক্ষা দিতে আসছেন। প্রথম গুরু বিদুষী ভৈরবী। আদেশ পেয়েছেন, তিনজনকে তন্ত্রসাধন করাতে হবে। দু'জনের দেখা পেয়েছেন পূর্ব দেশে। তৃতীয়জন রয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে। খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছেন এক সকালে।

তন্ত্রসিদ্ধ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। চৌষট্টি তন্ত্রের দুরূহ সাধনা অক্লেশে, অনায়াসে শেষ করলেন। প্রায় চার বছর ধরে তন্ত্রসাধন চলেছিল। এরপর শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন গুরুর গুরু। ভৈরবী! তুমি যে এখনো অপূর্ণ। তন্ত্র আমাকে দিলে, গ্রহণ করলুম। স্বীকার করলুম, এইবার তুমি চলে যাও বৃন্দাবনে। জ্ঞানের অহঙ্কার, অধিকারের অভিমান ফেলে দিয়ে প্রেম সাধ। নাহং, নাহং, তুঁহুঁ তুঁহুঁ। ঈশ্বর হলেন প্রেম। তিনি সমন্বয়। বহুকোণ বিশিষ্ট একটি রত্ন।

এর পর শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাস নিলেন। গুরু নিজেই এলেন পরিব্রাজকাচার্য পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী। জটাজূটধারী, দীর্ঘদেহী, পুরী সম্প্রদায়ের সাধু। তন্ত্র করলে, মধুরভাব সাধলে, এবার নিরাকারে চলো। বেদান্তের পথ ধরে সমাধিতে। অতি গোপনে পঞ্চবটীর সাধনকুটিরে শুরু হল সাধন। বিরজা হোম সমাপ্ত। শিখা, সূত্র ত্যাগ। 'আমি'র বিসর্জন হোমাগ্নিতে। তোমার মৃত্যু হল। তুমি এখন ব্রহ্মলীন। ওঠো, উঠে যাও, উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে। অনন্তে। গভীর রাত। আসনে শিষ্য। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। নির্বিকল্প আত্মধ্যান। এই প্রথম ভগবান হার স্বীকার করলেন মানুষ গুরুর কাছে। শিবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মে প্রবেশ করতে পারছেন না। শক্তি সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। ভ্রূমধ্যে মা কালী হাসছেন। শুভ্র দন্তপংক্তি। বিজলি ঝিলিক।

ওগো! আমি পারছি না। মায়া থেকে বেরতে পারছি না। রূপ থেকে অরূপে যেতে পারছি না। আমার হচ্ছে না।

মধ্য রাত। হোমের শিখা সংযত। গুরুর হুঙ্কার, কেঁও হোগা নেহি।

ঘরের কোণে এক টুকরো ভাঙা কাচ। ফলার তীক্ষ্ণ দিকটা ভুরুর মাঝখানে জোরে চেপে ধরে বললেন, হিঁয়া রাখো।

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান খড়্গ বের করলেন। এবার যেই মা এলেন মোহিনীমূর্তিতে সঙ্গে সঙ্গে কেটে দুখণ্ড করে দিলেন। মন হুহু করে এই নামরূপ রাজ্যের ওপরে উঠে গেল। গুরু তোতাপুরী অনেকক্ষণ বসে রইলেন সামনে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সাধনার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলতেন, 'মন হুহু করে সমগ্র নামরূপ রাজ্যের ওপরে চলে গেল—আমি সমাধিস্থ হলাম।' নাগা সন্ন্যাসী ল্যাংটা তোতাপুরী

সাধনকুটিরের দরজায় তালা দিয়ে বাইরে পাহারায় বসলেন। ভেতর থেকে ইঙ্গিত এলে দরজা খুলে দেবেন। দিন গেল, রাত এল, তিন দিন এইভাবে অতিবাহিত হল। গুরু তোতাপুরী ভয় পেলেন। কী হল! তালা খুলে কুটিরে প্রবেশ করলেন।

যেমন রেখে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক সেই ভাবেই বসে আছেন। দেহ যেন প্রাণহীন ; কিন্তু মুখমণ্ডল প্রশান্ত গম্ভীর, জ্যোতির্ময়। নিবাত নিষ্কম্প একটি দীপশিখা। এই মূর্তিই আজ মন্দিরে মন্দিরে। গৃহীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। অজুত কণ্ঠে বন্দিত,

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নর-রূপ ধর, নির্গুণ গুণময়।।

অশ্রুসিক্ত শতচক্ষু। নরদেব দেব, জয় জয় নরদেব। তুমি ভববৈদ্য। গুরু তোতাপুরী বিস্মিতি—'য়হ ক্যা দৈবী মায়া!' ইয়া, দৈবী মায়া! এই অবস্থায় আসতে গুরুর লেগেছিল ছেচল্লিশ বছর, শিষ্যের লাগল মাত্র তিনদিন।

একটানা এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে থেকে তোতাপুরী যেমন এসেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের পথ ঠিক করে নিলেন, 'রসে বশে' থাকব। শুকনো সন্ন্যাসী হব না। ওপরতলা থেকে, হেড কোয়ার্টার থেকে আদেশ এল, 'ভাব মুখে' থাক। জনক রাজার মতো দুটো তরোয়াল ঘোরাও, একটা জ্ঞান আর একটা ভক্তি। সাকার আর নিরাকারের মধ্যে 'বাচ' খেলাও। কখনো ব্রহ্মে থাক, কখনো মায়ায়। গোখরো সাপ হয়ে যাও, বৈরাগ্য বিষের ছোবলে বিষয় বিষ নাশ করে দাও। যারা আসবে তাদের লটকে দাও। ভক্ত কণ্ঠে যুগ যুগ ধরে গীত হোক, মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং/তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।

শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিবাড়ির ছাতে উঠে আজান দিলেন, সব চলে এসো। যে যেখানে আছ সব চলে এসো। দুটি ভক্তির কথা কই, দুটো ভগবানের কথা কই। সন্ধ্যার বাতাসে সেই আহ্বান চরাচরে ভেসে গেল—কলিং কলিং, শ্রীরামকৃষ্ণ কলিং। শ্রীরামকৃষ্ণ ওয়েভ। তৈরি হবে শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য—এম্পায়ার। আমি বসে আছি তোমাদের জন্যে ভাব সাজিয়ে। গৃহীদের জন্যে কৃপা, সন্ন্যাসীদের জন্যে মুক্তি। আমি ঈশ্বরের জন্যে 'ষোল টাং' করেছি, তোমরা একটাং করো।

When Keshab speaks, the world listens। ব্রহ্মর্ষি কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে যোগাযোগে কামারপুকুরের দরজা এইবার কলকাতার দিকে খুলে গেল। যুবক গদাধর মথুরবাবুর সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা—'সেজবাবুর সঙ্গে জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম কেশব সেন বেদিতে বসে ধ্যান করছে। তখন ছোকরা বয়স। আমি সেজবাবুকে বললাম, 'এই ছোকরার ফাতনা ডুবেছে—বঁড়শির কাছে মাছ এসে ঘুরছে।' দুজনের দেখাদেখি। কেশবচন্দ্র সেই দর্শনের দার্শনিক—একমেবাদ্বিতীয়ম। ঈশ্বর এক। অনন্ত ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন—একই বহু হয়ে বসে আছেন। তাঁর ইচ্ছা। বহুর মধ্যে

এক। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কী রকম? 'একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল—ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল, জগন্নাথের গায়ে ঠেকে কি না। একবার এ-ধার থেকে ও-ধারে দণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না। দেখে যে সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নেই, আবার দণ্ড এ-ধার থেকে ও-ধারে লয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। তখন সন্ন্যাসী বুঝলে যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।'

এইবার কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন। ইংরেজি 'সানডে মিরর' পত্রিকার ১৮৭৫ সালের ২৮ মার্চ-এর সংখ্যায় লিখলেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে দর্শন করেছি। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের সরলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কথার মাঝে ব্যবহৃত নিরবচ্ছিন্ন উপমা ও রূপক যেমন সুসঙ্গত, তেমনি সুন্দর। অতি শান্ত, কোমল ও চিন্তাশীল।'

When Keshab speaks —বিশিষ্ট, বিদগ্ধ, প্রতিষ্ঠিত, ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের ঘরে সংবাদ মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবেশ। ধর্মচর্চা তখন একটা 'ক্রেজ'। ফিলজফি আর ফিজিক্স পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে এগোচ্ছে। কান্ট, হেগেল, হিউম, নিউটন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, চার্বাক, শঙ্কর, রামানুজ, বেদান্ত, ভাগবত—চলো যাই, দেখে আসি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে — When Keshab says.

১৮৭৯, নভেম্বর ১৩

গোখরো সাপের ঘরে দুই অজ্ঞেয়বাদীর প্রবেশ। ঈশ্বর মানেন না। ভেতরে একটা 'ভ্যাকুয়াম'। সংসারের সব আনন্দ 'স্টেল' হয়ে গেছে। 'নো পাঞ্চ'। জীবনটাকে কি ভাবে 'মিনিংফুল' করা যায়! চলো যাই।

দরজার বাইরে দু'জন। ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত আর ব্যবসায়ী মনোমোহন মিত্র। দুজনে পরস্পরের আত্মীয়। কড়া নাড়লেন। দরজা খুলেন একজন। কোথায় সেই সন্ন্যাসী, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।

পরমহংস কোথায় জানি না বাপু! এই রামকৃষ্ণ তোমাদের সামনে। 'বসুন, বসুন।' বসুন তো বসুন। একেবারে বসিয়ে দিলেন। রামচন্দ্র আজও বসে আছেন ঠাকুরের সঙ্গে কাঁকুড়গাছির 'যোগোদ্যানে'। যক্ষ মোহরের কলসি আগলায়। রামচন্দ্র আগলে আছেন ঠাকুরের ভস্মাধার।

বিয়ের ছোবল নয় 'প্রেমের ছোবলে দু'জনেই বিমোহিত। উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে এলেন দুই গৃহী। অবিরত ভেতরে ধ্বনিত হচ্ছে সেই আহ্বান—'আবার এসো!' অন্তরে অবিরত আরতি।

এলেন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। ডস্ট কোম্পানির (Dost) মুৎসুদ্দি। প্রচুর উপার্জন। মদ্যপান, বেশ্যাগমন। কিন্তু উদার। বিপদগ্রস্ত, অভাবী মানুষকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করতেন। সব আনন্দই ক্রমে বিস্বাদ। অর্থ আর প্রলোভন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে। প্রথম ঘণ্টা বাজালেন অদ্ভুত এক সন্ন্যাসিনী। মিত্তির মশাই এক দ্বিপ্রহরে পথে হাঁটছেন, হঠাৎ প্রদীপ্ত চেহারার এক সন্ন্যাসিনী কাছে এসে একটি কথাই বললেন, 'বাছা, একমাত্র তিনিই সত্য, আর সবই মিথ্যা।' আর কোনো কথা নেই। তিনি নিমেষে অদৃশ্য হলেন নিমতলার পথে।

কে এই সন্ন্যাসিনী! শ্রীরামকৃষ্ণ নন ত!

ভেতরে শুরু হয়ে গেল ডামাডোল। ইন্দ্রিয়দের বশে আনার উপায়। পরাজিত সুরেন্দ্র। এ-জীবন তবে আর রাখি কেন! রামচন্দ্র দত্ত বললেন, তুমিও চল। তিনি ছাঁচ বদলে দিতে পারেন। অহংকারী সুরেন্দ্র বললেন, 'তোমার সাধুটি যদি প্রতারক হন, তবে কান দুটি মলে দিয়ে আসব।'

উদ্ধত ভঙ্গি। ঠাকুরকে কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করলেন না। ভক্তদের মধ্যে বসলেন, বিশিষ্ট একজন। কান মলে দেবেন। ঠাকুর তাঁকে সরাসরি কিছু বললেন না। ভক্তদের বলছিলেন, সুরেন্দ্র শুনলেন। ঠাকুর বলছেন, 'মানুষ বেড়াল ছানার মতো ব্যবহার করে না কেন? বানর ছানার মতো ব্যবহার করে কেন? বানর ছানা মায়ের পেট আঁকড়ে ধরে থাকে। নিজের চেষ্টা। ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে। বেড়াল ছানা পড়ে পড়ে মিউ মিউ করে। তার মা নড়া ধরে যেখানে নিয়ে যায় সেইখানেই থাকে। দেখ আত্মচেষ্টায় কাজ করা, আর ভগবানের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকার মধ্যেও এই তফাত।'

সুরেন্দ্র চমকে উঠলেন, এ কথা ত তাকেই বলা হচ্ছে। আমি ও বানরছানার মতো চলি। সুরেন্দ্রনাথের ভক্তি ছিল। অন্তর ছিল। সংস্কার ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ওয়েভ লেংথ ধরতে পারলেন। আমার জীবনের দুঃখ দূর করতে হলে আমাকে সমর্পিত বেড়াল ছানা হতে হবে। বিদায়কালে ঠাকুর বললেন, 'আবার এসো—আসতে ভুলো না।' ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রের সংশয় ঝরে গেছে। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

সুরেন্দ্র শুধু এলেন না। তিনি হলেন ঠাকুরের অন্যতম রসদদার। কথামৃতকার মাস্টারমশাই লিখলেন, 'ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া! তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। কোমারবৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দুধর্মেকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। ভাই, তোমার ঋণ কে ভুলিবে?'

ঠাকুরকে ঘিরে একটি অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী তৈরি হল। ১৮৮১ থেকে ১৮৮২-র মধ্যেই অন্তরঙ্গ গৃহীভক্তরা সব এসে পড়লেন। সুরেন্দ্র মিত্রের সমসময়েই এলেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'প্রেমিক ভকত এক আইল আসরে।' তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। ঢাকার সরকারি অফিসে অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করতেন। হালিশহরবাসী। ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ১৮৮০ সালে।

ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ জুটিলেন ভবনাথ পরম সুন্দর। ১৮৮১ সাল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথ জুটিকে বলতেন 'হরিহরাত্মা'। ঠাকুর বলতেন, নরেন্দ্রনাথ 'পুরুষ', ভবনাথ 'প্রকৃতি'।

বলরাম বসু ।। 'মনোহর ভক্তবর বসু বলরাম/শহর অঞ্চলে বাগবাজারেতে ধাম/" ১৮৮২ সাল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলায় তাঁর বিরাট ভূমিকা। একমাত্র বলরাম ভবনেই ঠাকুরের সর্বাধিকবার পদার্পণ। ভবন রূপান্তরিত হল 'মন্দিরে'। ঠাকুর বলতেন আমার কলকাতার 'কেল্লা'।

মাস্টার (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ॥ ১৮৮২, ২৬ ফেব্রুয়ারি। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এলেন ঠাকুরের সন্দর্শনে। শুরু হল, 'কথামৃত'। মাস্টারমশাই লিখছেন, 'সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত।' তারিখটি স্পষ্ট করে বললেন না। রহস্যে ঘিরে রাখলেন 'বসন্তকাল, ইংরেজি ১৮৮২, মার্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে।'

গিরিশচন্দ্র ॥ দূর থেকে দেখলেন, বাগবাজারের দীননাথ বসুর বাড়িতে। একেবারে মুখোমুখি হলেন 'স্টার থিয়েটারে'। তারিখ, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪, রবিবার। ঠাকুর স্টারে 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এলেন। অবশেষে গিরিশ বলবেন, 'প্রভু, তুমিই ঈশ্বর, মানুষদেহ ধারণ করে এসেচ আমার পরিত্রাণের জন্যে।'

Soldiers of Ramkrishna

একেবারে উপযুক্ত শিরোনাম। শ্রীরামকৃষ্ণের সৈন্যবাহিনী। এম্পারার রামকৃষ্ণ। জেনারেল নরেন্দ্রনাথ। ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে, পশ্চিমের গঙ্গার দিকের দরজা দিয়ে নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ। বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। গঙ্গার দিক থেকে গঙ্গার ধারা এল। ভগীরথ মর্তে গঙ্গা অবতরণ করিয়েছিলেন, শিব ধারণ করেছিলেন জটায়। শিবরূপী নরেন্দ্রনাথ এলেন রামকৃষ্ণ গোমুখীতে। রামকৃষ্ণ প্রবাহ এইবার মুক্ত হবে। শিব এলেন শক্তির ঘরে। শিব চেয়েছিলেন সমাধি। শক্তি চাইলেন সমিধ্।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের সমাধি-স্বপ্ন ঘুচিয়ে দিলেন—তোর হাড় কখানিও চাই। আমি বজ্র তৈরি করব। সত্য সত্যই বজ্রপাত হয়েছিল মহাসমাধির আগের দিন। লাটু মহারাজের স্মৃতি—'দুপুরবেলা একটা বাজপড়ার মতো আওয়াজ হয়েছিল। মা

ও লক্ষ্মীদিদি সেই আওয়াজ শুনে ঠাকুরের ঘরে এসে গেলেন—লক্ষ্মীদিদি বড্ড ভয় পেয়েছিল।

ত্যাগী পার্ষদদের মধ্যে ঠাকুর যে ছয়জনকে নিত্যসিদ্ধ বা ঈশ্বরকোটি বলে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁরা হলেন—নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন আর পূর্ণ। এই ছ'জনের মধ্যে তিনজন বিবাহ করেছিলেন। পূর্ণ (পূর্ণচন্দ্র ঘোষ) গৃহী হয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালের মার্চ মাসে ঠাকুরের কাছে প্রথম আসেন। পিতা, রায়বাহাদুর দীননাথ ঘোষ। উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী। পূর্ণচন্দ্রকে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'বিষ্ণুর অংশে জন্ম।' তাঁর আগমনে ওই শ্রেণীর ভক্তদের আগমন পূর্ণ হল।

যোগীন্দ্র (নাথ রায়চৌধুরী), পরে স্বামী যোগানন্দ। নামে মাত্র বিবাহিত। ঠাকুর দেখামাত্রই ঈশ্বরকোটী বলে চিনেছিলেন। রাখাল (রাখালচন্দ্র ঘোষ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ঠাকুরের মানস পুত্র। আগমনের আগেই ঠাকুর তাঁকে ভাব নেত্রে দেখেছিলেন। কাশীপুরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, রাখালের 'রাজবুদ্ধি'। নরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাইদের আদেশ দিলেন, রাখালকে সবাই রাজা বলে ডেকো। রাখালচন্দ্র ছিলেন বিবাহিত। একটি সন্তান জন্মাবার পরেই চিরকালের জন্যে সংসার ত্যাগ করলেন।

ঠাকুরের রোলকল—নরেন্দ্রনাথ! আমি তোমার বিবেকানন্দ।

রাখালরাজা! তোমার ব্রহ্মানন্দ।

যোগীন্দ্র, আমার অর্জুন! আমি যোগানন্দ।

বাবুরাম! আমায় আপনি প্রেমানন্দ করবেন।

নিরঞ্জন, শ্রীরামচন্দ্রের অংশ! হাজির, আমি নিরঞ্জনানন্দ।

তারকনাথ! আমি যে শিবানন্দ।

শরৎচন্দ্র! হাজির প্রভু! দক্ষিণেশ্বরে একদিন হঠাৎ আমার কোলে বসে আমার ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করেছিলেন। আমি সারদানন্দ। আমি মা সারদার প্রহরী।

শশিভূষণ! প্রস্তুত। ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণানন্দ।

কালীপ্রসাদ! রেডি স্যার! তুমি অভেদানন্দ।

লাটু! তুই অদ্ভুত, তাই অদ্ভুতানন্দ।

হরিনাথ! আমি তুরীয়ানন্দ।

গোপালচন্দ্র! তুমি আমার বুড়ো গোপাল। হয়ে যাও অদ্বৈতানন্দ।

সারদাপ্রসন্ন। প্রভু! তুমি প্রবেশিকা পরীক্ষার দিনে সোনার ঘড়ি হারিয়ে ফল খারাপ করে ফেলেছিলে। খুব মন খারাপ! সে ও আমার সঙ্গে দেখা হবে বলে। তুমি ত্রিগুণাতীতানন্দ হবে!

গঙ্গাধর! এদিকে এস! তুমি হও অখণ্ডানন্দ।

সুবোধচন্দ্র! প্রভু হাজির। তোমার উত্তম বংশ। ঠনঠনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী দেবীর দেবায়েত শঙ্কর ঘোষের পৌত্র কৃষ্ণদাস তোমার পিতা। তুমি হবে সুবোধানন্দ। নরেনের বেলুড়মঠে তোমাকে সবাই আদর করে ডাকবে, 'খোকা মহারাজ'।

হরিপ্রসন্ন! প্রেজেন্ট স্যার! বিজ্ঞানী আমার কাছে এসেছিল বলে তোমার মা বলেছিলেন, 'সেই পাগলের ওখানে গিয়েছিলে, যে সাড়ে তিনশ ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?' যাও, তুমি বিজ্ঞানানন্দ হয়ে নরেনের রামকৃষ্ণ মন্দির তৈরি করবে বেলুড়ে।

দুর্গাচরণ! কৃপা করুন প্রভু। তুমি 'নাগ মহাশয়' নামে বিখ্যাত হবে।

সেই ছাত

কাশীপুর উদ্যানবাটীর ছাতে দাঁড়িয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিচের দিকে তাকালেন। শীতের নরম রোদে পড়ে আছে সবুজ উদ্যান। মনে হচ্ছে তপোভূমি। সন্ন্যাসীর দল তৈরি। আর কয়েকদিন পরেই তারা গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের মালা পাবে। উদ্যানের এক কোণে নরেন্দ্র রোজ রাতে যে ধুনি জ্বলিয়ে সকলকে নিয়ে ধ্যানে বসে, তার ছাই ছড়িয়ে আছে।

ওই ত গৃহী ভক্তরা সব ঘুরছে। সংখ্যা তিরিশ ছাড়িয়েছে। এরা সব পরিচিত, কেউ রবাহূত নয়। ওই ত সব, আমার পাঁচ বছরের সঙ্গী—গিরিশ, তার ভাই অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী, হারাণ, রামলাল, অক্ষয়, উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাঁধুনী ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলি, ভূপতি, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হরিশ। ভক্তদের 'ফুল হাউস'। সব কড়াইয়ের ডালের খদ্দের। 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই সংসারী জীবের কভু গতি নাই।' ভক্ত এখানে যারা আসে দুই থাক। এক থাক বলছে, 'আমায় উদ্ধার কর, হে ঈশ্বর!' যারা অন্তরঙ্গ, তারা বলে, রামকৃষ্ণ তুমি কে? তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী?

ঠাকুর রামলালকে নিয়ে নেমে এলেন উদ্যানে, গৃহীদের পাওনাটা আজ মিটিয়ে দি। প্রথম গিরিশ। ঠাকুর সমাধিস্থ। অক্ষয় মাস্টার প্রমুখ কয়েকজন 'গাছের উপর ডালে ডালে বানর বানর' খেলা করছিলেন। অক্ষয় ছুটে এলেন। হাতে ছিল দুটি জহর চাঁপা। ঠাকুরের পায়ে রাখলেন।

ভাবস্থ ঠাকুর অকাতরে বলতে লাগলেন, 'চৈতন্য হোক', 'চৈতন্য হোক'।

ঠাকুর উঠে গেলেন দোতলায়। এরপর তিনি নামবেন নরেন্দ্রের কাঁধে চেপে।

বিভাজন

সবার নরেন্দ্রাদি একান্ত পার্ষদদের দেখাতে হবে গৃহীদের স্বরূপ। গৈরিক শ্রীরামকৃষ্ণ বৈরাগ্যের চূড়া তুলবেন থই-থই গৃহীদের মাঝে। সংসার সমুদ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের দিশারী আলো। চিরকালীন একটি সংগঠন রামকৃষ্ণ মিশন। শীঘ্রই দেহঘট ভেঙে সেই শক্তিমণ্ডল রচনা করবেন। এমন কি পশ্চিম ভারতের একটি দুর্গও তাঁর দখলে আসবে। বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে 'রামকৃষ্ণ এম্পায়ার'।

হিসেবীর চৈতন্য হওয়া মানে আরো হিসেবী হওয়া।

রাম দত্ত প্রমুখ গৃহী ভক্তরা মাঝে মাঝেই উদ্যানবাটীর খরচের হিসেব দেখতে চাইতেন। একদান প্রবল অশান্তি—'বেহিসেবী খরচ হচ্ছে! বড্ড বেহিসেবী খরচ।'

নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তার মানে? আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করে এখানে চুরি করতে এসেছি?

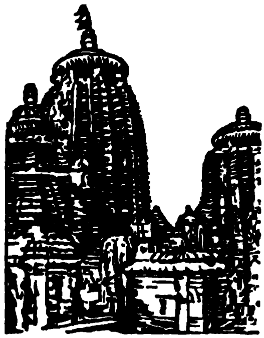
জান, ঠাকুরের সেবায় আপনাদের টাকা আমরা আর ছোঁব না। আমরা ভিক্ষে করে ঠাকুরের সেবা চালাব।'

নিরঞ্জন ভাইকে নির্দেশ দিলেন, ঠাকুরের ঘরে গৃহীদের প্রবেশ নিষেধ করে দাও। শ্রীরামকৃষ্ণ একখানি গেরুয়া আর একটি মালা গিরিশচন্দ্রের জন্যে আলাদা করে রেখেছিলেন। ব্যতিক্রমী দুই গৃহী—গিরিশচন্দ্র আর সুরেন্দ্রনাথ।

গিরিশচন্দ্র হিসেবের কাগজ কুঁচি কুঁচি করে ফেলে দিলেন, "শালার হিসেব। আমার বাড়ির ইট একখানা, একখানা করে বিক্রি করে প্রভুর সেবার খরচ চালাব।'

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বললেন, 'তুই আমাকে কাঁধে করে যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকব।'

শেষ আদেশ। সেটি বলার জন্যেই এই পটভূমি। পরোক্ষ নির্দেশ হল—সংসারীদের জন্যে করবে, অবশ্যই করবে। তাদের নিয়ে করবে না। রসুনের বাটি না পোড়ালে গন্ধ যায় না। কাম আর কাঞ্চন কলির মায়া।



কল্পতরু ও গিরিশচন্দ্র

ঘোর নাস্তিক। উত্তর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত বংশের সন্তান। আদরে, আব্দারে মানুষ। একগুঁয়ে, একরোখা। যা করবেন, তা করবেনই। বাধা পেলে ভয়ঙ্কর। ইন্টেলেকচুয়াল। প্রখর প্রতিভার অধিকারী। অভিনয় প্রতিভা ও সাহিত্য প্রতিভা। অত্যন্ত মেধাবী। গণিত শাস্ত্রে অসীম পারঙ্গমতা। বিজ্ঞানমনস্ক। সাহেব কোম্পানিব খাশা হিসাব রক্ষক। দায়িত্বশীল, বিশ্বাসী। সায়েবরা তাঁকে ভালবাসেন। ভীষণ পড়ুয়া। প্রচুর বই কেনেন। নানা বিষয়ের ভাল ভাল বই। গোগ্রাসে পড়েন। পড়ার ঝোঁক এলে, দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে আর তাঁকে দেখা যায় না। এসিয়েটিক সোসাইটির সভ্য। যশস্বী অভিনেতা। সবাই বলেন, বাঙলা থিয়েটারের 'গ্যারিক'। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে 'ভীম সিংহের' ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে নাটোরের মহারাজ তাঁকে রাজবেশ আর তরবারি উপহার দিয়েছিলেন। উদার গিরিশচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সেই উপহার থিয়েটার সম্প্রদায়কেই দান করে দিলেন।

কিন্তু ভীষণ দাম্ভিক, অহঙ্কারী। গম্ভীর আত্মা। এতই তাঁর অহঙ্কার মাথা নত করে প্রথানুযায়ী গুরুজনদের প্রণাম করতে হবে বলে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি মাড়ান না। নিজের জগতে থাকেন। প্রচুর মদ্যপান করেন। গণিকা সঙ্গে অভ্যস্ত। অভিনয় ও রচনা শক্তির প্রতিভায় যাবতীয় কলুষ চাপা পড়ে গেছে।

দেব-দেবী মানেন না। মা দুর্গাকে কুড়ুল দিয়ে কেটে খণ্ড খণ্ড করলেন। চলার পথে নির্জন স্থানে শিবলিঙ্গ দেখলে অপবিত্র করে অপেক্ষা করতেন শিব শাস্তি দেন কি না। সত্যবাদী, অপ্রিয় স্পষ্টবক্তা, অনুসন্ধিৎসু গিরিশ। কোনো লুকোচুরি নেই, হ্যাঁ, আমি মদ খাই। বেশ্যাগমন করি, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী আমি মানি না। আমি মানুষের ভণ্ডামি সহ্য করতে পারি না। নির্যাতিতের পাশে গিয়ে পর্বতের মতো দাঁড়াই। কাঁধে করে মৃতদেহ নিয়ে যাই শ্মশানে। পরিত্যক্ত গঙ্গাযাত্রীকে দুধ নিয়ে গিয়ে খাওয়াই। আমার অনেক শত্রু, আমি গ্রাহ্য করি না।

আমি গিরিশচন্দ্র নই, আমি গিরিশচণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরের খবর তিনি রাখতেন না। জানতেন না সেখানে একজন ধর্মবিজ্ঞানী এসেছেন। এসেছেন মানব বিজ্ঞানী। নিজের পরিচয় দেন এই ভাবে, দিনের মধ্যে আমি সাতবার মরি সাতবার বেঁচে উঠি। গিরিশচন্দ্র না জানলেও শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন। বাগবাজারের বোসপাড়ায় একজন নেমেছে, সে রামকৃষ্ণলীলার পার্ষদ। দড়ি আলগা দেওয়া আছে। যা করার করে নিক। ভোগ, দুর্ভোগ সব শেষ করুক। না জেনেই এমন কিছু করুক যাতে মানুষের কল্যাণ হয়। সে লোকশিক্ষক। অহং-এর আঁচ কমলেই নিজেকে আবিষ্কার করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধিতে সব দেখতে পেতেন। মা তাঁকে দেখিয়ে দিতেন। তিন কালের খবর তাঁর কাছে চলে আসত। অক্ষয়কুমার সেন 'রামকৃষ্ণ পুঁথিতে' লিখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভব—

কালীর মন্দিরে আমি আপনার মনে
উপবিষ্ট হেনকালে দেখি নিরখিয়া,
আইল মুরতি এক নাচিয়া নাচিয়া।
কেবা সে যখন আমি জিজ্ঞাসিনু তায়,
কহিল, 'ভৈরব মুই আইনু হেথায়।'
'কিবা প্রয়োজন?'—তারে পুছিলে আবার
উত্তর করিল, 'কার্য করিব তোমার।'
গিরিশ আমার কাছে আসিবার পর,
দেখিনু ভৈরব সেই তাহার উপর।

দুজন দু'জগতে। সাধনার জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ, নাটকের জগতে গিরিশচন্দ্র। বারাঙ্গনাদের দিয়ে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করাতে হয়। মহলা দিতে হয়। সরোজিনী, শশিমুখী, বিনোদিনী, তিনকড়ি, আরো অনেকে। রাত বাড়ে, নেশা চড়ে, পালা জমে। দর্শকদের উচ্ছ্বাস। পর্দা পড়ে যায়। নাটকের চরিত্ররা নেমে আসে বাস্তবে। অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দারিদ্র, লোভ, লালসা, প্রতিযোগিতা, চরিত্রহীনতা। থিয়েটারের পেছনে যাঁরা টাকা ঢালেন তাঁদের অন্য মতলব থাকে। ম্যানেজার এবং ডিরেক্টার গিরিশচন্দ্রকে এই জগৎ সামলাতে হয়। এইসব রমণীদের যত আব্দার আর কোঁদল সহ্য করতে হয়। থিয়েটারের বাণিজ্যের দিকে প্রখর নজর রাখতে হয়। সময়ের নাড়ি টিপে পড়তে হয়, কোন পালা চলবে, কোন পালা 'ফ্লপ' করবে! তিনি নিজেই নাট্যকার। যশস্বী অভিনেতা। অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য। প্রচুর পড়াশোনা। বিদেশি নাটক মন দিয়ে পড়েন। শেক্সপিয়ারে অসাধারণ দখল। ইংরিজী যেমন বলেন, সেই রকম লেখেন। 'ম্যাকবেথ' বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন। সে এক চ্যালেঞ্জ। গিরিশের গোঁ। তিনি পরাজয় স্বীকার করবেন না। 'টাওয়ারিং পার্সোন্যালিটি'। হেয়ার স্কুলে

গিরিশচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন গুরুদাস ব্যানার্জি। পরে হাই কোর্টের জজ হলেন। স্যার উপাধি পেলেন। বিখ্যাত মানুষ, স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি। গুরুদাস বলেছিলেন, গিরিশ শেক্সপিয়ারের কিছু কিছু নাটক বাঙলায় অনুবাদ করতে পারলে বাঙলা ভাষার খুব উপকার হত। তবে খুবই কঠিন কাজ। ধর না, ম্যাকবেথের ডাইনিদের সংলাপ। বাঙলা করা দুঃসাধ্য। গিরিশের গোঁ, হবে না মানে! গিরিশচন্দ্র সেই সময় অ্যাটকিনসন কোম্পানির বুককিপার। একটি খাতা আর ম্যাকবেথ সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। খাতাটি কখনো কখনো অপিসের ড্রয়ারে থাকে। অনুবাদ প্রায় শেষ। এমন সময় তাঁর জীবনে এল প্রথম দুর্যোগ। রুদ্র গিরিশ আসলে প্রেমিক। স্ত্রী বিয়োগ হল। বেশ কিছু দিন অন্যমনস্ক ছিলেন। খেয়াল রইল না ম্যাকবেথের পাণ্ডুলিপিটি যে অফিসের ড্রয়ারে! এইবার দুর্যোগের উপর দুর্যোগ, অ্যাটকিনসন কোম্পানির অফিস নিলাম হয়ে গেল। আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবল,পাণ্ডুলিপি-সহ ডেস্ক, সব বিক্রি হয়ে গেল। দমে যাবার পাত্র ছিলেন না গিরিশচন্দ্র। আবার শুরু করলেন অনুবাদ। মঞ্চস্থ হল নাটক। নামভূমিকায় গিরিশচন্দ্র। লেডি ম্যাকবেথ-তিনকড়ী দাসী। স্যার গুরুদাস লিখলেন,... performed the difficult task very creditably on the whole. His translation is worthy of the original.

এই জগতের গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে যাবেন কেন? কেন উঁকি মেরে দেখবেন ছোট্ট ঘরখানিতে কোন সাধকের লীলা চলছে। ঠাকুর বলতেন চুম্বক পেরেককে টানে, আবার পেরেকও চুম্বককে টানে। পেরেকের গায়ে মাটি ময়লা লেগে থাকলে চুম্বক টানতে পারে না। গিরিশচন্দ্র নিজেও জানেন না তাঁর জীবন কী ভাবে ঘুরবে। কৃপা কোন পথ ধরে আসবে। অযাচিত কৃপায় তাঁর জীবন কী ভাবে ধুয়ে যাবে। নট, নাট্যকার গিরিশের চেয়ে কী ভাবে বড় হয়ে উঠবে ভক্ত ভৈরব গিরিশের পরিচয়!

প্রথম যৌবনে অতিরিক্ত আদরে বখে যাওয়া এক যুবক। চোদ্দো বছর বয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন। তিনটি নাবালক ভাই। পনেরো বছর বয়সেই দিদি বিয়ে দিয়ে দিলেন। দিদির যুক্তি, মাথার উপর যখন অভিভাবক স্থানীয় কেউ নেই, তখন গণ্যমান্য বিজ্ঞ একজন ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে সব দিকেই ভাল! অ্যাট্‌কিনসন টিলটন কোম্পানির বুককিপার নবীনচন্দ্র দেব। শ্যামপুকুরের বিখ্যাত মানুষ। তাঁরই কন্যা প্রমোদিনী গিরিশচন্দ্রের স্ত্রী হলেন। বিয়ের দিন কলকাতায় ঘটে গেল ঐতিহাসিক অগ্নিকাণ্ড। নিমতলার কাঠের গোলায় আগুন লাগল। ভয়ঙ্কর সেই আগুন ছুটে আসছে বাগবাজারের দিকে। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। আগুন এই বার গিরিশচন্দ্রের বাড়ি গ্রাস করবে। বিয়েবাড়ির আমোদ-প্রমোদ মাথায় উঠল। গৃহদেবতা শ্রীধরজী বাঁচান বাঁচান। রক্ষা করল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বিশাল একটি তেঁতুলগাছ। আগুন ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই তেঁতুলগাছে। বৈশ্বানরের শেষ আহার।

বিয়ের পর আবার ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। পরবর্তীকালের অনেক বড় মানুষ

তাঁর সহপাঠী ছিলেন। স্যার গুরুদাস, সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। মেধাবী, অধ্যবসায়ী ছাত্র, কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছেন। তবু প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর ধাতে সইল না। কেন? তাঁর লেখা নল-দময়ন্তী নাটকে বিদূষকের মুখে তার আভাস রেখেছেন, 'গুরুমশায় শালা যে কান মলে দিলে, নইলে ক, খ শিখতুম।' গিরিশচন্দ্র নিজে বলেছিলেন, 'পশু চাবুকে বশ হয়, মানুষ নয়। আমার স্বভাব ছিল, জুজুর ভয় দেখালে জুজু দেখতে আগে ছুটতুম। গিরিশচন্দ্র ভয় কাকে বলে জানে না।'

গোটা উত্তর কলকাতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ বুঝতে পারছেন না, এই ছেলেটির পরিণতি কী হবে! আর একজন বড় ঘরের ছেলেরও একই স্বভাব। অদূরেই তাঁর বাড়ি। দত্তবংশীয় বিলে। অনেকেই যুবকটিকে উদ্ধত, অহংকাবী ভাবেন। গিরিশ ঘোষ ধর্মকর্ম মানেন না। নরেন্দ্রনাথের অন্বেষণ ঈশ্বর। শর্ত একটাই যদি কোনো সাধক দেখাতে পারেন, তবেই বিশ্বাস করব। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ ছুঁয়ে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিভূমিতে নরেন্দ্রনাথকেও দর্শন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রিগেডে নরেন্দ্রনাথ মেজর জেনারেল। আবার গিরিশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ হবেন নরেন্দ্রনাথ। গিরিশচন্দ্র তাঁর এতটাই কাছে চলে আসবেন, যে স্বামীজী তাঁকে সম্বোধন করবেন জি. সি. বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার দুটি ধারা—একটির রঙ গেরুয়া আর এটির রঙ সাদা। একদিকে বসবেন সন্ন্যাসীরা, অপর দিকে গৃহীরা। দুটি স্তম্ভ তৈরি হবে। একটি স্তম্ভ নরেন্দ্রনাথ। অপর স্তম্ভ গিরিশচন্দ্র। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রোগশয্যায়। আর কয়েকদিন পৃথিবী বাস। নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ঠাকুরের যুবক ভক্তবৃন্দ, যাঁদের তিনি গেরুয়া দিয়েছিলেন, তাঁরা ঘর-সংসার, লেখাপড়া, দেহ-সুখ সব ভুলে ঠাকুরের সেবা করছেন, মা সারদা আছেন, গৃহী ভক্তরা ঠাকুরের চিকিৎসা, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদির খরচ সামলাচ্ছেন। একখানি গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে দিয়েছিলেন।

গৃহীরা খরচ চালাচ্ছেন। তাঁরা বললেন, সমস্ত খরচের একটা হিসাব রাখা উচিত, 'টু দি পাই'। নরেন্দ্রনাথ শুনে বললেন, 'এত হিসেব রাখা কেন? এখানে কেউ ত চুরি করতে আসেনি।' ঠাকুরের অন্যতম গৃহীভক্ত রামবাবু মাঝে মাঝে হিসাব দেখতেন। একবার হিসাব দেখতে দেখতে রামবাবুরা হুলস্থূল লাগিয়ে দিলেন—'এ কি, এত খরচ, বেহিসেবী খরচ-খরচা, এ চলবে না। চলতে পারে না।' মহা হইচই। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'চালাতে হবে না। রামবাবুদের টাকা নেওয়া হবে না। আর গৃহীদের ঠাকুরের ঘরে 'নো এন্ট্রি'। ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

কিন্তু খরচা, খরচা কে চালাবে! ঠাকুর বলতেন, গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচা আনা বিশ্বাস। তিনি এগিয়ে এলেন। সেই সময় তাঁর যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল না। থিয়েটার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত। গিরিশচন্দ্র বীর ভক্তের মতো

বললেন, 'কুছ-পরোয়া নেহি। আমি খরচ সামলাব। প্রয়োজন হলে ভিটে মাটি বিক্রি করে দেবো।' গৃহীদের দিকে গিরিশচন্দ্র হয়ে উঠলেন স্তম্ভ।

নরেন্দ্রনাথ বড় অভিমানে অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে সব জানালেন। ঠাকুর বললেন, পুঁথিকারের ভাষায়,

নরেন্দ্র দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়।।
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি মোরে তেমতি থাকিব।।
নরেন্দ্র বলেন, স্কন্ধে তোমায় লইয়া।
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া।।
এত শুনি গুণমণি কন বার বার।
গৃহীদের টাকাকড়ি লইও না আর।।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর লীলায় লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী সেই যে প্রবেশ করেছিলেন, আর নিষ্ক্রান্ত হতে পারেননি। ঠাকুরের সেবায় দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর আর মা দু'জনেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই গোলোযোগের সংবাদে লক্ষ্মীনারায়ণ ছুটে এলেন। টাকা রেখে চলে গেলেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তরা জানেন, ঠাকুর সে টাকা নেবেন না। অবশেষে ঠাকুরের মধ্যস্থতায় এই তিক্ততার অবসান হলেও, একটা ব্যবধান রয়েই গেল।

ঠাকুরের জগতে কী ভাবে প্রবেশ করলেন গিরিশ! শুধু প্রবেশ করলেন না, হয়ে দাঁড়ালেন একজন অভিভাবক, পরম সুহৃদ, পরামর্শদাতা। অনেক রকমের ধাক্কা খেতে খেতে একটু একটু করে পথ ঘুরতে লাগল। নদী যেন ধারা পাল্টাচ্ছে। প্রথমা স্ত্রী চলে গেলেন। গিরিশচন্দ্র ফ্লাই বার্জার কোম্পানির কাজে ভাগলপুরে। একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে পড়ে গেলেন অন্ধকার গুহায়। পড়লেন না, সাহসী গিরিশ দুঃসাহসে ভর করে গুহা দেখতে গুহায় নামেন। দেখা গেল, গুহায় ঢোকার পথ আছে বেরোবার পথ নেই। সে এক জীবন-মরণ সমস্যা। গিরিশের দেখাদেখি বন্ধুরাও নেমেছেন। সব ক'জন যেন পাতকুয়ায় পড়েছেন। ভগবান ছাড়া উদ্ধারের আশা নেই। বন্ধুরা বললেন, এস সবাই মিলে বিপদভঞ্জতেন মধুসূদনকে ডাকি। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নাস্তিক গিরিশ বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে ডাকতে লাগলেন। কারণ সকলের অভিযোগ, নাস্তিক সঙ্গে থাকায় এই বিপদ ঘটেছে। প্রার্থনা মাত্রই সামনে পথ দেখা গেল। গুহার বাইরে এলে গিরিশচন্দ্র যে কথা বললেন, সে কথা গিরিশচন্দ্রই বলতে পারেন—'ভাই আজ বিপদে পড়েই তাঁকে ডাকলাম; কিন্তু যদি বিশ্বাস করে কখনও তাঁর নাম নিতে পারি তবেই নেব—বিপদে কি মৃত্যুভয়ে নয়।'

বেশ! তাই হোক! ভগবান অদৃশ্যে থেকে বললেন। গিরিশ শুনতে পেলেন না। নিমতলার আগুনে উত্তর কলকাতা জ্বলছে। গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হচ্ছে। বয়েস পনেরো। তিরিশ বছর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ। মৃত্যু গিরিশচন্দ্রের জীবনসাথী। প্রথমে মা, তারপরে বাবা। মৃত্যু অনুসরণ করে আসছে। মারা গেলেন দ্বিতীয়া ভগিনী কৃষ্ণকামিনী। তার অল্পদিন পরেই চলে গেলেন অনুজ কানাইলাল। তেইশ বছর যখন বয়েস একমাসের জন্যে একটি পুত্রসন্তান লাভ। এরপরেই ছোটভাই ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যু। কিছুদিন পরেই আর এক বোনের মৃত্যু। এর পর মৃত্যু হল তাঁর স্ত্রীর। দু হাতে আপ্রাণ সেবা করেও তাঁকে ধরে রাখা গেল না। গিরিশের জীবন 'হরি বোল' ধ্বনির ওপর ভাসমান।

দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। ভাঙা সংসার আবার গড়ে উঠতে লাগল। দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম সুরতকুমারী। সিমলার বিখ্যাত মানুষ লালচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্রী, বিহারীলাল মিত্রের বড়মেয়ে। বিয়ের ছ'মাস পরেই গিরিশচন্দ্র আক্রান্ত হলেন বিসূচিকা রোগে। বাঁচার আশা নেই। মৃত্যু দাঁড়িয়ে শিয়রে। টেনে রাখা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মৃত্যুপথযাত্রী গিরিশচন্দ্র ঘোর-লাগা অবস্থায় দেখছেন, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অদৃষ্টপূর্ব এক মাতৃমূর্তি। তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর, স্নেহপূর্ণ দুটি চোখ, পরে আছেন লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি। সেই মা বলছেন, গিরিশ! এই মহাপ্রসাদটুকু খাও। গিরিশচন্দ্রের যখন চমক ভাঙল, দেখলেন মুখে সেই স্বাদ লেগে আছে। গিরিশচন্দ্র অলৌকিক ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন। পরে জানতে পারলেন, কে এসেছিলেন দিব্যমূর্তি ধারণ করে।

বেঁচে উঠলেন বটে, শরীর কিন্তু সারছে না। এদিকে চারিদিকে শত্রু। বন্ধুরাও শত্রুর মতো আচরণ করছেন। তাঁকে বিধ্বস্ত করতে চাইছেন। এতকাল পুরুষকার দিয়ে লড়াই করেছেন। আর যে পারা যাচ্ছে না। তাহলে কি দৈবের আশ্রয় নিতেই হল! কোন দেবতাকে ডাকবেন! নিজের শরীরের জন্যে, বিপন্মুক্তির জন্যে! মহাদেব। ভুবনের পতি যিনি। তুঁহি জগত গুরু তুঁহি পরমেশ্বর/আদি অনাদি পিনাকধর শঙ্কর।

গিরিশচন্দ্র সর্বব্যাধিহর ৺তারকনাথ মহাদেবের শরণ নিলেন। কেশ-শ্মশ্রু রাখলেন। শুরু হল নিত্য গঙ্গাস্নান, শিবপূজা আর হবিষ্যান্ন গ্রহণ। মহাদেব হাসলেন নাকি! এমন কথা বললেন কি? মনে পড়ে গিরিশ, তুমি কী ভাবে আমাকে অপবিত্র করতে আমি রেগে যাই কি না দেখার জন্যে। তখন শত্রুভাবে পূজা করতে এখন মিত্রভাবে। দুটোই তোমার পূজা।

এই সময়কালে গিরিশচন্দ্র প্রতিবছর শিবরাত্রি-ব্রত পালন করতেন। তারকেশ্বরে গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতেন। বীরভূমের অট্টহাসে গিয়ে তন্ত্রসাধন করলেন। মায়ের দর্শন পেলেন নিজের বাড়িতে। কালীঘাটে গিয়ে হাড়িকাঠের কাছে আসন পেতে মা কালীর উপাসনা করতেন। সিদ্ধাই এল। খাম না খুলেই চিঠি পড়তে

পারতেন। ওষুধ ছাড়াই ইচ্ছাশক্তিব প্রয়োগে অসুখ ভাল করতে পারতেন। সর্বক্ষণ মুখে মুখে মা, মা রব। থিয়েটারের কর্মীদের বলতেন, মাকে ডাক, শুধু মাকে ডাক। বাবা তারকনাথের কাছে প্রার্থনা করতেন, 'আমার সংশয় ছেদন কর। গুরু ছাড়া যদি সংশয়চ্ছেদন না হয়, তাহলে তুমি আমার গুরু হও।

দেখতে দেখতে গিরিশচন্দ্র হয়ে উঠলেন এক মহাসাধক। নাটক ও নাট্যরচনা হল সাধনার অঙ্গ। সাফল্য যেন ছুটে ছুটে এল। নাটক লিখছেন, অভিনয় করছেন, পরিচালনা করছেন, অভিনয় শেখাচ্ছেন, স্টেজে নাটক নামছে আর হই হই পড়ে যাচ্ছে। রাতেব পর রাত 'হাউসফুল'। 'দক্ষযজ্ঞে' দক্ষরূপী গিরিশচন্দ্রকে দেখে দর্শকদের বুক কেঁপে যেত। কলকাতার দর্শক আর সমালোচকরা ছিলেন অতিশয বোদ্ধা। গিরিশচন্দ্র তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন। নাটকরচনার সময়ে স্মরণ রাখতেন। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সেই ভাবে তৈরি করতেন। সেকালের সমালোচকরা ভালোকে ভাল বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। খারাপ হলে শুইয়ে দিতেন।

'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে উদ্বোধন হল বিনোদিনীর স্টার থিয়েটার। ১৮৮৩, ২১ জুলাই। বিনোদিনীর নামে নাম হওয়ার কথা ছিল 'বি-থিয়েটার'। গুর্মুখ রায় সেই জন্যেই টাকা ঢেলেছিলেন। শেষ মুহূর্তে কয়েকজনের কলা-কৌশলে সে নাম হল না। অভিনয়কে ভালবেসে বিনোদিনী মেনে নিলেন এই প্রতারণা।

'দক্ষযজ্ঞ' কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এক হই হই আলোড়ন। প্রথম রাতের অভিনয় প্রসঙ্গে বিনোদিনী বলছেন, আমি সতী, গিরিশচন্দ্র দক্ষরাজ। স্টেজে ঢুকে আমি ত ভয়েই মরি! কি লোক, কি লোক লোকারণ্য। খড়খড়ি দেয়ালে লোক সব ঝুলে ঝুলে বসে আছে। কলকাতার বড় বড় লোক, বড় বড় সমালোচক। আর দক্ষের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র। পর্বতের মতো ওই বিশাল শরীর, গলায় রাগী সিংহের গর্জন, চোখে আগুনের ফুলকি ছুটছে। আর সেই সাংঘাতিক সংলাপ ; অপমান—মান আছে যার, ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী? যজ্ঞস্থলে দক্ষ এই বলে মেয়েকে অপমান করছেন। দর্শকরা শিউরে উঠছেন। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবরূপী অমৃতলালের হাহাকার—'কে-রে দে-রে সতী দে আমার'। সাত দিন ধরে কলকাতার পথেঘাটে মানুষের মুখে মুখে দক্ষরাজের সেই সংলাপ—'অপমান মান আছে যার........'

গিরিশচন্দ্র জানেন না, তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন গুরুর দিকে নয়, একেবারে পরমগুরুর দিকে। কোন শুভক্ষণে, কোন অদৃশ্য শক্তির আহ্বানে তিনি রচনা করলেন 'চৈতন্যলীলা'। ১৮৮৪ সাল, ২ আগস্ট। স্টারে প্রথম অভিনীত হল 'চৈতন্যলীলা'। চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনী। অকল্পনীয় দুঃসাহস। বিনোদিনীর জীবন এইবার ঘুরে যাবে। অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা প্রথমে তিনি পাবেন। রঙ্গালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মাথায় হাত রেখে বলবেন, 'চৈতন্য হোক'। ১৮৮৪ সাল, ২১ সেপ্টেম্বর। গিরিশচন্দ্র পরে বিনোদিনীর আত্মজীবনীর ভূমিকায় লিখলেন, 'বিনোদিনী

অতি ধন্যা, অনেক পর্বত গহ্বরবাসী এ আশীর্বাদের প্রার্থী।' পতিতা বিনোদিনী কোন সাধনায় সেই রাতে এমন কৃপা পেলেন! অভিনয়ের জন্যে সাধনা। 'অষ্টপ্রহর গৌরাঙ্গমূর্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।' গিরিশচন্দ্র লিখছেন, 'অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন।'

সে রাতে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের ম্যানেজার। সে রাতে তাঁর জীবনে মনে রাখার মতো একটি ঘটনাই ঘটেছিল—ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে তাঁর থিয়েটারে এসেছেন শুনে, গিরিশচন্দ্র তাঁকে 'রিসিভ' করতে গেলেন। ঠাকুরই তাঁকে প্রথমে প্রণাম করলেন। গিরিশচন্দ্র প্রতিনমস্কার করলেন! ঠাকুর আবার নমস্কার করলেন। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলল। প্রণামে গিরিশচন্দ্র পরাস্ত হলেন। এই দিনের এই ঘটনা স্মরণ করে ভক্ত গিরিশ অপূর্ব একটি কথা বলেছিলেন—'রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎ জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জয় হবে প্রণামঅস্ত্রে।' সেই রাতে অভিনয় দর্শনে মতোয়ারা ঠাকুর এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে একটি কথাই বলেছিলেন, 'আসল নকল এক দেখলাম।' এটি গিরিশচন্দ্রের তৃতীয় দর্শন।

'ঢং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে!'

কেশবচন্দ্র সেনের 'ইন্ডিয়ান মিরারে' গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের কথা পড়লেন। গিরিশচন্দ্র সবে কলেরা থেকে বেঁচে উঠেছেন। হীন স্বাস্থ্য, চতুর্দিকে বিভ্রান্তি। তারকেশ্বর মহাদেবের আরাধনা শুরু করেছেন। গুরুর সন্ধান করছেন। সংশয় মেঘ কাটছে না কিছুতেই। তাই ভাবছেন, 'ব্রাহ্মরা কি আবার এক পরমহংস খাড়া করেছে।' এমন সময় একদিন খবর এল তাঁরই পাড়ায় দীননাথ বসুর বাড়িতে পরমহংসদেব এসেছেন। আচ্ছা দেখা যাক কেমন পরমহংস। গিয়ে দেখলেন, ঠাকুর ধর্মপ্রসঙ্গ করছেন আর কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ভক্তগণ পরমানন্দে আস্বাদন করছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হল। একটি সেজ জ্বেলে ঠাকুরের সামনে রাখা হল। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্ধে হয়েছে?'

গিরিশচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন, 'ঢং দেখ, সন্ধে হয়েছে! সামনে সেজ জ্বলছে, সন্ধে হয়েছে কিনা বুঝতে পারছেন না!' বাড়ি ফিরে এলেন।

'চল, আর কি দেখবে?'

কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় দর্শন। গিরিশচন্দ্র লিখছেন, 'রামকান্ত বসুর স্ট্রিটস্থ বলরাম বসুর ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। সাধূত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—দর্শন করিতে

গেলেম। দেখিলাম পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্তনী তাহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোকসমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না ; তবে কেহ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি, আমার পূর্বের ইয়ার তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'বিধু ওঁর পূর্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে।' কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, 'চল, আর কি দেখবে?' আমার ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন।'

'না, না, ঢং নয়-ঢং নয়'

গিরিশচন্দ্র চমকে উঠলেন। প্রথম দর্শনের দিন ঢং শব্দটাই মনে ঢংঢং করে উঠেছিল। মনের কথা শুনলেন কি করে! আবার বলছেন, 'বাবু আমি ভাল আছি, বাবু আমি ভাল আছি।' বলতে বলতেই সমাধিস্থ। গিবিশচন্দ্র সমাধি দেখেননি। ভাবছেন এ কী অবস্থা। আজকে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা নয়। বোসপাড়ার চৌরাস্তায় একটা রকে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, পূর্ব দিক থেকে ঠাকুর ধীর পায়ে হেঁটে আসছেন। সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত। চোখে চোখ পড়তেই পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে নমস্কার করলেন। গিরিশচন্দ্র প্রতিনমস্কার করলেন। ঠাকুর নমস্কার ফেরালেন না। গ্রহণ করলেন। ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের সামনে দিয়ে দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলেছেন। গিরিশচন্দ্রের মনে হল, 'যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে।

ঠাকুর কিছুটা দূরে এগিয়ে গেছেন। গিরিশচন্দ্রের মনে হচ্ছে, আমিও যাই। এমন সময় ঠাকুরের সঙ্গের এক ভক্ত এসে বললেন, পরমহংসদেব ডাকছেন।

'আমি চলিলাম'

আর ফেরা যাবে না গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অজগরের পাল্লায় পড়ে গেলেন। বার বার তিনবারই হয়তো হত। ঠাকুরকে থিয়েটারের বক্সে বসিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। শরীর ভাল ছিল না। আসলে বুঝতে পারেননি কে এসেছেন। এই চতুর্থ দর্শন থেকে শুরু হবে, আপনার শ্রীরামকৃষ্ণের পথে চলা। আবার সেই বলরাম বসুর বাড়িতে। গিরিশচন্দ্রের আজ ভাল লাগছে। তিনি এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, 'গুরু কী?' এ-প্রশ্ন

কেন? এই একটি জায়গায় তাঁর মনে একটি প্রতিরোধ বসে আছে। মানুষকে গুরু করলেই নির্দ্বিধায় বলতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে— গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। এই মন্ত্রে প্রণাম করতে হবে। 'সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিব!' এই গোলমাল আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন এক চিত্রকর। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব। তিনি বললেন, 'আমি রোজ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন। কখনো কখনো রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে , কিন্তু উপযুক্ত গুরুর আশ্রয়ে গুরুকৃপা ছাড়া এমন ভাগ্য হয় না।' এই কথা শুনে ঘরের দরজা বন্ধ করে গিরিশচন্দ্র কাঁদতে লাগলেন। ঠিক তিন দিনের দিন ঠাকুরের সঙ্গে এই তাঁর দেখা।

ঠাকুর তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'গুরু কি জান—যেন ঘটক।' তার পরেই বললেন, 'তোমার গুরু হয়ে গেছে।' গিরিশচন্দ্র তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'মন্ত্র কী?' ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বরের নাম।' একটি গল্প বললেন। দৃষ্টান্ত। 'রামানুজ রোজ প্রাতঃস্নান করতেন। ঘাটের সিঁড়িতে কবীর নামে এক জোলা শুয়েছিল। রামানুজ নামছেন। কবীরের গায়ে হঠাৎ তাঁর পা ঠেকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কবীরের শরীরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জেগে উঠল। তিনি 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করলেন। আর সেই নাম জপ করেই তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন।'

বড় আনন্দ নিয়ে ফিরে এলেন। দম্ভের খোলস খুলে পড়ে গেল। 'চূর্ণ-বিচূর্ণ। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমাকে প্রণাম করলেন। তারপরে রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি—এ ধারণা আমার জন্মাল। আমার অহঙ্কারও খর্ব হল।'

'বিশ্বাস করো'

পঞ্চম দর্শন। কিছু দিন পরে, ১৮৮৪ সাল, ১৪ ডিসেম্বর। স্টারে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখতে এসেছেন ঠাকুর। গিরিশচন্দ্রের অহঙ্কারের কাঠামো তখনো দাঁড়িয়ে আছে। দেবেন্দ্রবাবু, ঠাকুরের পরম ভক্ত, ছুটে এসে বললেন, পরমহংসদেব এসেছেন, আপনি অভ্যর্থনা করে আনবেন না। গিরিশের উত্তর 'আমি না গেলে তিনি আর গাড়ি থেকে নামতে পারবেন না।' গিরিশচন্দ্র লিখছেন, 'কিন্তু গেলাম। আমি পঁহুছিয়াছি এমন সময় তিনি গাড়ি হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিল।'

গিরিশচন্দ্রের পাষাণ হৃদয়। সে-হৃদয় গলছে। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন। এই পরম শান্ত মানুষটিকে আমি অভ্যর্থনা করতে চাইনি। ঠাকুরকে দোতলায় নিয়ে এলেন। শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। পরে বহুদিন তাঁর এই মনে হয়েছিল—কেন তিনি

প্রণাম করলেন। একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ তুলে দিলেন ঠাকুরের হাতে। ঠাকুর হাতে নিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কী করব?'

সেদিন ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে গিরিশচন্দ্রের ভেতরের খবর দিয়েছিলেন, 'তোমার মনে বাঁক আছে।' গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'যায় কিসে?' ঠাকুর বললেন, 'বিশ্বাস করো।'

'মনের বাঁক যাবে ত।'

ষষ্ঠ দর্শন। মধু রায়ের গলিতে। ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। 'তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রামবাবুর উঠানে, রামবাবু খোল বাজাইয়া পরমহংসদেবে নৃত্যের সহিত সঙ্গত করিতেছেন। ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে। গান হইতেছে, নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিল্লোলে।' গিরিশের চোখে জল। রামবাবুর আঙিনা সত্যই যেন টলমল করছে। ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। ভক্তরা প্রণাম করছেন। গিরিশের খুব ইচ্ছে হচ্ছে। সকলের সামনে প্রণাম করতে লজ্জা করছে। ঠাকুর পবের বেড়ে নাচতে নাচতে একেবারে গিরিশচন্দ্রের সামনে এসে সমাধিস্থ হলেন। গিরিশচন্দ্রের চরণ স্পর্শে বাধা রইল না। কীর্তন শেষে সবাই বৈঠকখানায় এসে বসলেন। ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছেন। গিরিশচন্দ্র পরপর তিনবার প্রশ্ন করলেন, একই প্রশ্ন—'আমার মনের বাঁক যাবে তো?' ঠাকুর একই উত্তর দিলেন তিনবার—'যাবে', 'যাবে', 'যাবে'।

অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে

সপ্তম দর্শন। গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ঠাকুর দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটি কম্বলে বসে আছেন। আর একটি কম্বলে বসে আছেন ঠাকুরের পরম ভক্ত ভবনাথ। গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণাম করলেন। মনে মনে 'গুরুব্রহ্মা' স্তবটি আবৃত্তি করলেন। ঠাকুর বসতে বললেন। বললেন, 'আমি তোমার কথাই বলছিলুম, মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো।'

গিরিশচন্দ্র বললেন, 'আমি উপদেশ শুনব না, আমি অনেক উপদেশ লিখেছি। উপদেশে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করে দিতে পারেন করুন।'

তখন ঠাকুর বললেন, 'পর্বতগহ্বরে নির্জনে বসলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ।'

গিরিশচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?'

গিরিশের কৌতূহল গিরিশের মতো দাম্ভিকের মস্তক কার চরণে অবনত হল।

কে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ!

পরমহংসদেব বললেন, 'আমায় কেউ কেউ বলেন, আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে রাজা রামকৃষ্ণ, আমি এইখানেই থাকি।'

গিরিশচন্দ্র ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ চাইলেন, 'আমি আপনাকে দর্শন করেছি, আবার কি আমায় যা করতে হয়, তাই করতে হবে।'

ঠাকুর বললেন, 'তা করো না। তাতে কোনো দোষ নেই।'

পরম আশ্রয়দাতা

শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রকে নিষেধ করতেন না। ঠাকুর বলতেন, 'না গো না, ওকে কিছু বলতে হবে না ; ও নিজেই সব কাটিয়ে উঠবে। পরে জীবন স্মৃতিচারণে গিরিশচন্দ্র লিখলেন, 'এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ সেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি এ কি আপদ!'

মদে চুর হয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোড়ার গাড়িতে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর সেবক লাটুমহারাজকে বলছেন, 'গাড়িতে কিছু ফেলে এল কি না দেখে আয়।' মাতাল গিরিশ আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর রাতে পঞ্চবটীতে হাত ধরাধরি করে আনন্দে হরিনাম আর নৃত্য করছেন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কাল। ঠাকুরের রথ আসতে আর দেরি নেই। ১৮৮৫, ২৮ জানুয়ারি—ঠাকুর কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে 'স্টারে' এসেছেন 'নিমাইসন্ন্যাস' দেখতে। গিরিশচন্দ্র দোকান থেকে গরম গরম লুচি ভাজিয়ে আনলেন। ঠাকুরের সেবা হবে। পালা শেষ হল। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র মদ্যপান করেছেন। ঠাকুর দেড়খানা লুচি খেয়েছেন, হঠাৎ গিরিশচন্দ্র আব্দার ধরলেন, 'তুমি আমার ছেলে হবে। বল, এ জন্মে ত আর তোমার সেবা করতে পারলুম না, আমার ছেলে হলে তোমায় খুব সেবা করতে পারব।' ঠাকুরের হাতে ধরা রয়েছে আর আধখানা লুচি, তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'আমি কেন তোমার ছেলে হতে যাব গো?'

গিরিশ নেশার ঘোরে ভীষণ রেগে গেলেন। অকথ্য গালাগাল। ঠাকুরের পাশেই লাটু মহারাজ—'হামার বড় রাগ হয়েছিলো, হাতে ডাণ্ডা ছিলো, ডাণ্ডা তুলতে যাব কি দেবেনবাবু হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'উনি যখন সয়ে যাচ্ছেন, তুমি কেন ডাণ্ডা তুলছ?' ঠাকুর কেবল হাসছেন আর বলছেন, 'এটা কোন্ থাকের ভক্ত রে? এটা বলে কি?' গিরিশের মুখের তোড় থামছে না।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরবেন। ঠাকুর গাড়িতে উঠেছেন। ভক্তরাও উঠেছেন। গিরিশচন্দ্রও নেমে এসেছেন পথে। গাড়ির সামনে কর্দমাক্ত রাস্তার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে তাঁর

পরমহংসদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। গাড়িতে ঠাকুর লাটুমহারাজকে বললেন, 'ও কি রে! গিরিশের গায়ে হাতে তুলতে আছে কি? দেখলি নি, এত গালাগালি দিলে তবু গাড়িতে ওঠবার সময় মাটিতে শুয়ে প্রণাম করলে। ওর কেমন বিশ্বাস দেখেছিস? মা, ও নেটো (নট) গিরিশ, তোমার মহিমা কি বুঝবে। ওর অপরাধ নিও নি মা।'

ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম গিরিশ

নরেন্দ্রনাথ সেদিন গিরিশচন্দ্রের পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, 'ধন্য তোমার বিশ্বাস ভক্তি!' পরেব দিনের ঘটনা। ভক্তরা এসে বলছেন, 'ওটা পাষণ্ড! ওর কাছে আর যাবেন না।' এমন সময় রামচন্দ্র দত্ত মশাই এসেছেন। ঠাকুর বলছেন, 'শুনেছ গো রাম! দেড়খানা লুচি খাইয়ে গিরিশ কাল আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার কবেছে।'

রামবাবু বললেন, 'কী করবেন? সে তো ভালই করেছে।'

ঠাকুর বলছেন, 'শোন, শোন, তোমরা সবাই শোন, রাম কি বলে—এর পরে আমায যদি মারে?'

'মার খেতে হবে।'

'সে কি গো! মার খেতে হবে?'

'হ্যাঁ, শুনুন তাহলে। কালীয়নাগের বিষে রাখাল বালকদের মৃত্যু হল। শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করে নাগকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী কারণে বিষ উদ্গীরণ কর?' নাগ বললে, 'প্রভু, যাকে অমৃত দিয়েছ, সে তাই দিতে পারে, আমায় যে খালি বিষ দিয়েছ, আমি অমৃত কোথায় পাব!' গিরিশকে যা দিয়েছেন, সে তাই দিয়ে আপনার পূজা করেছে। আমাদের বললে মানহানির মামলা করতে কোর্টে দৌড়তুম। আপনি পতিতপাবন।'

ঠাকুর বললেন, 'রাম তবে গাড়ি আন।'

বেলা দুটো। ঠাকুরের গাড়ি বেরলো দক্ষিণেশ্বর থেকে।

আজ বুঝেছি তুমি সেই

বোসপাড়ার বাড়িতে গিরিশচন্দ্র। অনুতপ্ত অথচ নিশ্চিন্ত। আহারাদি ত্যাগ করে বসে আছেন। গিরিশ চণ্ড কিন্তু ভণ্ড নন। বসে বসে প্রহর গুনছেন। হয় শেষ না হয় শুরু। সকাল থেকে বন্ধুরা এসে উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। হঠাৎ দরজায় ছায়া পড়ল। সেই মধুর কণ্ঠস্বর—'গিরিশ—ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম।'

গিরিশচন্দ্র সপাটে ঠাকুরের পায়ে এসে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'আজ যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর, তাহলে বুঝতুম, তুমি এখনো নিন্দাস্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারনি—তোমার পরমহংস নামে অধিকার আসেনি—আজ বুঝেছি তুমি সেই,

তুমি সেই। আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আর তোমায় ছাড়ছি না। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে।

গিরিশচন্দ্রের পদধূলি নিলেন নরেন্দ্রনাথ—'ধন্য তোমার বিশ্বাস ভক্তি।'

দে তোর বকলমা

তুই যখন কিছুই পারবি না, দে আমাকে ভার দে। বকলমা দে। তোর হয়ে আমিই সব করব। তুই লোক শিক্ষা দিয়ে যা। 'গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিসনে। তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণপদে প্রথম অঞ্জলি

১৮৮৫, ৬ নভেম্বর। ঠাকুর অসুস্থ। শ্যামপুকুর বাটিতে। চিকিৎসা চলছে। ঠাকুরও চিকিৎসা চালিয়েছেন। জীবের উদ্ধার। কলকাতার মানুষের চিকিৎসা। এসো, চলে এসো। অন্ধকারে আলো নিয়ে যাও। নিজেকে প্রকাশ করছেন। ক্যানসার একটি উপলক্ষ।

কালীপুজোর রাত। পূজার আয়োজন করিয়েছেন ঠাকুর। প্রতিমা নেই। আসনে ঠাকুর। সামনে গিরিশাদি ভক্তরা। একদিকে নানাবিধ নৈবদ্যে। এমন কি একপাত্র বার্লি। বার্লি ছাড়া ঠাকুর অন্য কিছু খেতে পারছেন না। স্তূপাকার জবা ফুল। রক্তকমল। দুদিকে বড় বড় দুটি মোমবাতি। বাড়ি দীপমালায় সজ্জিত। সবই প্রস্তুত। একটি প্রশ্ন থমকে আছে—কি পূজা, কার পূজা!

সাহসী গিরিশচন্দ্রকে সামনে এগিয়ে দিলেন জনৈক ভক্ত। গিরিশচন্দ্র এসে বসলেন ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে শেখাচ্ছেন 'আজকের এই পূজা'। কী করবে, কী ভাবে করবে। যা যা বললেন সেই ভাবেই গিরিশচন্দ্র করে করে আসছেন। হঠাৎ বললেন, 'তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দি।' জয় মা, জয় মা, রক্ত কমল, রক্তজবা ঠাকুরের পাদপদ্মে দিতে লাগলেন। সাহস পেয়ে অন্যান্য ভক্তরা ফুলে ফুলে ঢেকে দিলেন শ্রীপাদপদ্ম। আসনে 'বরাভয়করা' শ্রীরামকৃষ্ণ কালী।

সেই রাতে গিরিশচন্দ্রের কাছে ঠাকুরের যে প্রশ্নটি ছিল সেটি নিয়ে ঠাকুর চলে এলেন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে।

১লা জানুয়ারি, ১৮৮৬

কলকাতা সেদিন ছুটির মেজাজে। দুপুর থেকেই ভক্তদের আগমন হচ্ছে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। রোদ ঝলমলে বাগান। দোতলায় গুরুতর অসুস্থ পরমহংসদেব। তবু যেন একটা উৎসব। কেউ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ বসে আছেন গাছের তলায়।

হঠাৎ সবাই অবাক হয়ে দেখছেন উদ্যানের পথ ধরে স্বয়ং ঠাকুর এগিয়ে আসছেন ধীরে। বস্ত্রাবৃত। মাথায় সবুজ বমাতের কান-ঢাকা টুপি। তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন গাছতলায় উপবিষ্ট গিরিশচন্দ্রের দিকে। কালীপূজার রাতে যে-প্রশ্নটা এসেছিল, সেই প্রশ্নটা আজ গিরিশকে করতে হবে। দিনটি হয়ে রইল, চিরকালের একটি ছবি,

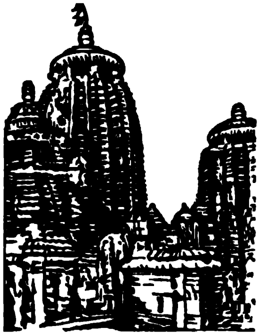
শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। গিরিশচন্দ্র পায়ের কাছে বীরাসনে।

হাত জোড়।

'গিরিশ! আমি কে?'

গিরিশের দুচোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নামছে, 'প্রভু! আমার বলার ক্ষমতা নেই। ব্যাস-বাল্মীকিও পারেননি।'

'তোমার পাঁচসিকে পাঁচ আনা।' এই 'চৈতন্যই' সকলের হোক।



নরেন কালী মানে না তাই ত যত কষ্ট

'মাকে মানিস না—সেই জন্যে তোর এত কষ্ট।'

'আমি তো মাকে জানি না।'

১৮৮৫ সালের ২ মার্চ থেকে ৭ মার্চের মধ্যে কোন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই কথোপকথন। নরেন্দ্রনাথ মাকে মা কালীকে মানেন না। কেন মানেন না! যদি না-ই মানেন, তাহলে মা কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি কেন যাওয়া আসা করেন! ঠাকুরকে প্রথম যেদিন দেখলেন, সেদিন তাঁর মনে হল মানুষটি অর্ধোন্মাদ—monomaniac।

১৮৮১ সালের পৌষ মাসে নরেন্দ্রনাথ তাঁর দুই বন্ধু এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত সুবেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ঘোড়ার গাড়িতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন। কেন এলেন। বড়লোকের ছেলে। সবল সুগঠিত দেহ। অতি রূপবান। তেজোদীপ্ত, সুন্দর, লাবণ্যমাখা মুখমণ্ডল। নাচ, গান, বাজনা, রঙ্গরসের বিধিদত্ত প্রতিভার অধিকারী। অন্তরে প্রীতি আর পবিত্রতা। সকলের প্রিয়। মেধাবী। আটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র।

কী কারণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন। 'অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন ঊনবিংশবর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবক।' মূর্তিপূজায় তিনি বিশ্বাসী নন। অকারণে গদগদ ভক্তি তিনি সহ্য করতে পারেন না। ভাব, ভাবালুতা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। আমি নিজে বুঝতে চাই, নিজে জানতে চাই, পরখ করে দেখতে চাই। বলা কথায় আমার বিশ্বাস নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, যে যেখানে আছেন থাকুন। না জেনে, না চিনে ধর্ম নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করছেন করুন। ধর্মের এই গ্রাম্যতায় আমি নেই। যদি মনে করো আমি নাস্তিক, হ্যাঁ আমি নাস্তিক। দাম্ভিক অহঙ্কারী। হ্যাঁ আমি তাই। আমি একটি প্রশ্ন হাতে নিয়ে জগতে প্রবেশ করেছি। এমন কেউ আছেন কি? সত্যবাদী, যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন, প্রত্যক্ষ। শোনা কথা নয়। হোই হোথায় ঈশ্বর আছেন,

সঙ্গে সঙ্গে নাচতে শুরু করলুম। বিশ মণ দুধ ঢেলে এলুম বাবার মাথায়। তিলকচর্চিত চিতাবাঘটি হয়ে বসে পড়লুম আসনে। শিষ্যরা মালা পরাতে লাগল। পদসেবা। ও ধর্ম যেমন আছে থাকে থাক। পুরোহিত নির্ভর। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, সত্যনারায়ণ, ঘণ্টাবাদন, চামর রজন। মরে কেউ স্বর্গে যায়, কেউ যায় নরকে। মেয়েলি ধর্ম আমাকে আকর্ষণ করে না। আমি চিত্ত বুঝি, আমি প্রায়শ্চিত্তও বুঝি না। তবে এটি বুঝি, 'এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন।' ট্র্যাডিসান। হাজার হাজার মানুষের প্রশ্নহীন বিশ্বাসের বেদিতে ভগবানের অবস্থান। যার বিশ্বাস নেই তার কী হবে! ওঁকার ধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি, হরিনামে সর্বপাপনাশ, শরণাগতের সর্বাপ্তি—এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে এবং পাচ্ছে ঘোড়ার ডিম।

ধর্মের তিনটি ব্যাপার তিনি মানতেন না। মন জুড়ে বিরাট এক সংশয়। প্রথমত, তিনি অবতার মানতেন না। দ্বিতীয়, সাকার উপাসনা, মূর্তিপূজা ঘৃণার চোখে দেখতেন। তৃতীয়, অদ্বৈতবাদ ও নাস্তিকতা একই জিনিস এই ছিল তাঁর ধারণা। এ ত মহাসমস্যা। সাকার দেব-দেবী মানেন না। নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মাও মানেন না। 'সবই ব্রহ্ম' এই কথা শুনলে ঠাট্টা করেন, 'তাহলে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম। মানুষ কেমন করে বলে, আমি ব্রহ্ম, জীব আর ব্রহ্ম অভেদ। এ ত এক ধরনের নাস্তিকতা। সৃষ্ট জীব নিজেকে স্রষ্টা ভাবছে। এর চেয়ে পাপ আর কী হতে পারে। মুনি-ঋষিদের মাথা খারাপ। এমন কথা লিখলেন কী করে?'

যখন বালক, তখন পুরাণ শুনতে ভীষণ ভালবাসতেন। শ্রুতিধর। রামায়ণ শুনে শুনে মুখস্থ। মেলা থেকে রাম-সীতার মূর্তি কিনে এনে ফুল দিয়ে সাজিয়ে ধ্যানে বসতেন। বালকের সেই ধ্যান এমনই প্রগাঢ় হত দরজা ভেঙে বালক বিলেকে বের করতে হত। রাম আর সীতার লীলাধ্যানে বালক মগ্ন চৈতন্য। কিন্তু যেই শুনলেন, রাম সীতাকে বিবাহ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যুগল মূর্তি ছুড়ে ফেলে দিলেন। ঘৃণার কারণ? কেউ একজন বলেছিলেন, বিয়ের মতো খারাপ কাজ আর কিছু নেই। ভগবান রাম সেই ঘৃণিত কাজ করেছেন। বালক বিলের হাতে রামচন্দ্রের দ্বিতীয়বার নিষ্ঠুর নির্বাসন। সীতারামের আসনে এসে বসলেন মহাদেব।

শৈশব থেকেই সন্ন্যাস সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত একটা রোমান্টিকতা ছিল। কারণ হয়ত এই, পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। গৌরবর্ণ সুপুরুষ দুর্গাপ্রসাদ অ্যাটর্নি অফিসে আইনজীবী ছিলেন। উত্তর কলকাতা নিবাসী দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের সুশিক্ষিতা ও পরমাসুন্দরী কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন। শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে দুটি সন্তান। প্রথমটি কন্যা। সাত বছর বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বনাথ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে এক

বছরের বড়। দুর্গাপ্রসাদের বয়েস তখন পঁচিশ। সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর সংসার, প্রচুর উপার্জন। কে বাজাল বৈরাগ্যের বাঁশী। সব ছেড়ে নিরুদ্দেশ।

দত্ত পরিবারে সন্ন্যাসের বাতাস। এই কাহিনী পরিবারে ভেসে বেড়াত। বালকের মনে ঘটনাটি স্বপ্ন হয়ে বাসা বেঁধেছিল। সোমবার শিবের বার। সেই বারেই নরেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে প্রবেশ করলেন। ১৮৬৩ সাল, ১২ জানুয়ারি। সবাই দেখে বললেন, অবিকল ঠাকুরদার মতো চেহারা, দুর্গাপ্রসাদ ভুলতে পারেননি। ছেলের কাছে ফিরে এলেন। বউমা ছেলের নাম রাখ 'দুর্গাদাস'। বীরেশ্বর শিবের প্রসাদে সন্তান লাভ। ভুবনেশ্বরী সন্তানের নাম রাখলেন 'বীরেশ্বর'। রাশ্যাশ্রিত নাম হল নরেন্দ্রনাথ। স্কুলে নরেন্দ্রনাথের ক্লাসে কোনো নতুন ছেলে ভর্তি হলে, নরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রশ্নই ছিল, তার ঠাকুরদা কি সন্ন্যাসী হয়েছেন? বন্ধুদের বলতেন, আমি সন্ন্যাসী হব। আমার হাতে সন্ন্যাসী হওয়ার একটা বিশাল রেখা আছে। মাথায় জটা। পরনে কৌপীন। হাতে দণ্ড কমণ্ডলু। গহন অরণ্যে হাঁটছি। একা একেবারে একা। তেষ্টা পেলে ঝরনার জল। গাছের তলায় শয়ন। আহার ফলমূল। তারপর হিমালয়ে। বরফ শুধু বরফ। বড় বড় সন্ন্যাসীরা সেখানে গুহার ভেতর ধ্যানে বসে থাকেন। কেউ তাদের দেখতে পায় না। আমিও গুহায় থাকব। সাধনা করব। আর ফিরে আসব না।

বালক নরেন্দ্রনাথের একটি প্রিয় খেলা ছিল, 'রাজা আর রাজসভা'। নরেন্দ্রনাথ রাজা। চণ্ডীমণ্ডপের সর্বোচ্চ ধাপে বসে আছেন। নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী, সেনাপতি, অধীনস্থ রাজারা আর অন্যান্য কর্মচারীরা পদমর্যাদা অনুসারে সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপে। শুরু হত দরবার, বিচারাদি রাজকার্য। রাজোচিত গাম্ভীর্যে। তিনি রাজা। বসে আছেন কল্পনার রাজ সিংহাসনে। এই রাজা ত এই সন্ন্যাসী। কল্পনা দুই বিপরীত মেরুতে ঘুর-পাক খাচ্ছে। একদিন এক ফালি গেরুয়া কাপড় কৌপীন করে পরেছেন। সারা বাড়ি ঘুরছেন সেই বেশে। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী রে?' বীরেশ্বর সোল্লাসে বললেন, 'মা, আমি শিব হয়েছি।' এইতেই শেষ নয়। কোথাও এইবার নির্জনে ধ্যানে বসবেন। ক্রমে উঠে যাবেন কোন আলোকে।

সাড়ে ছয় বছর বয়সের সুন্দর এক বালক মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে, 'মা দেখ, সাধুরা আমাকে কেমন সাজিয়ে দিয়েছে।' সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখা। পরিধেয় বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত। একখণ্ডে কৌপীন। আর এক খণ্ডে হয়েছে বহির্বাস। কে এই বালক? কামারপুকুরের গদাধর। শিমুলিয়ার বীরেশ্বরের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। দু'জনে একই তরঙ্গে ভাসছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কদিন সেই রহস্যে মোড়া কথা বলবেন, 'নরেন্দ্র আমার শ্বশুরঘর'। যে কথার অর্থ আজও বোঝা গেল না।

নরেন্দ্রনাথের নিদ্রা, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বালিশে মাথা রাখলুম, ঘুমিয়ে পড়লুম, তা হত না। নরেন্দ্রনাথ উপুড় হয়ে শুতেন। চোখ বোজান মাত্রই ভুরুর

মাঝখানে অপূর্ব এক আলোর বিন্দু ফুটে উঠত! নানা আকার ধারণ করত, নানা বর্ণ। ক্রমে একটি ডিমের আকার। তারপর হঠাৎ ফেটে গিয়ে তারাবাজির আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ত। শুভ্র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। আলোর সমুদ্রে তলিয়ে যেতেন বীরেশ্বর। এই ছিল বীরেশ্বরেব ঘুমিয়ে পড়া। তিনি ভাবতেন সকলেরই বুঝি এই রকম হয়। যৌবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানের ক্লাসে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুমের আগে জ্যোতি দেখিস?' বন্ধু বললে, 'কই না ত!' পরবর্তীকালে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই জিজ্ঞেস করবেন, 'জ্যোতি দেখিস?' 'যারা ধ্যান সিদ্ধ তারাই এইরকম জ্যোতি দেখতে পায়।'

এই সময় দুটি বিপরীত জীবনচিত্র তাঁর কল্পনায় দেখা দিত, একটি চিত্র, অশেষ ধন-জন, যশ-মান ভোগৈশ্বর্য। বসে আছেন সমাজের শীর্ষস্থানে। এই ছবিটি মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠত আর একটি ছবি, গৃহহীন, সম্বলহীন, কৌপীনমাত্র সম্বল, অরণ্য-পর্বতচারী সর্বত্যাগী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। বৃক্ষতলে বাস। মাধুকরী। আকাশবৃত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ার পর বরাহনগর মঠে সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা ভয়ানকভাবে চেপে বসল। কেবলই বলতেন, 'কৌপীন না পরলে আর উপায় নেই। মানুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন মায়ায় বদ্ধ হবে? মানুষের স্বরূপ কি? চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং। আমিই সেই সচ্চিদানন্দ।' এরপরেই দৃপ্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতেন,

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।।

এই অবস্থায় আসতে সময় লাগবে আরো সাত-আট বছর। গৌতম বুদ্ধ উদ্যান পথে ভ্রমণে বেরিয়ে চারদিন চারটি দৃশ্য দেখে সংসার ত্যাগ করলেন। প্রথমদিন প্রাসাদের পূর্বদ্বার দিয়ে বেরোলেন। দেখলেন, গলিত বৃদ্ধ। দ্বিতীয়বার বেরোলেন দক্ষিণদ্বার দিয়ে। দেখলেন ব্যাধিগ্রস্ত এক মানুষকে। তৃতীয়বার নিষ্ক্রান্ত হলেন পশ্চিম দ্বারপথে। দেখলেন শবযাত্রা। শেষদিন বেরলেন উত্তরপথে। দেখলেন এক প্রশান্ত ভিক্ষুমূর্তি। প্রশ্ন করলেন, সারথি। কে এই প্রশান্ত পুরুষ। সারথির উত্তর, দেব। ইনি সর্বত্যাগী ভিক্ষু। প্রব্রজ্য প্রাপ্তঃ সমমাত্মন। বোধিসত্ত্ব উৎফুল্ল—এই-ত আমার জীবন—সাধু সুভাষিত মিদং মম রোচতে চ। প্রব্রজ্য নাম বিদুমিঃ সততং প্রশস্তা।

মহাপ্রভু গয়ায় গেলেন। ঘর সংসার, পাণ্ডিত্যাভিমান, সব ভেসে গেল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সুরেন্দ্রনাথের গাড়ি দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসছে। বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ। গাড়ি এইবার পূর্বদিকের গেট ধরে ঢুকছে। ঘোড়া এগোচ্ছে পশ্চিমে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসছেন নরেন্দ্রনাথ। অনেকের ধারণা, ছেলেটা দাম্ভিক, উদ্ধত, অনাচারী। একজন প্রতিবেশী একদিন বলেই ফেললেন,

'এই বাড়িতে একটা ছেলে আছে, তার মতো ত্রিপণ্ড ছেলে কখনও দেখিনি। বি. এ. পড়ছে বলে ধরাকে যেন সরা দেখে—বাপ-খুড়োর সামনেই তবলায় চাঁটি

দিয়ে গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই চুরুট খেতে খেতে চলল!'

কেন আসছেন নরেন্দ্রনাথ। মা কালীকে দর্শন করতে? ১৮৫৫ সালের ৩১ মে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে নেমেছেন ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি। আর আজ ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাস। উনিশ বছরের যুবক। আগে আসেননি। আজ কেন আসছেন! কীসের টানে!

নরেন্দ্রনাথ যখন বালক বিলে তখন একদিন রামায়ণ পাঠের আসরে গেছেন। মহাবীর হনুমান তাঁর ভীষণ প্রিয়। হনুমানের আদর্শপরায়ণতায় তিনি মুগ্ধ। কথকঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন, হনুমান কলাবাগানে থাকেন। বীরেশ্বর প্রশ্ন করলেন, সেখানে গেলে কি তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। কথক ঠাকুরের বিদ্রূপাত্মক উত্তর, হ্যাঁ গো, গিয়েই দেখ না। বাড়ির কাছেই কলাবাগান। বাড়ি ফেরার পথে সেই অন্ধকারে কলাঝোপে মহাবীরের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। কোথায় মহাবীর! এক রাশ হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বয়স্করা প্রবোধ দিলেন, ওরে বিলে! মহাবীর আজ বোধহয় প্রভুর কাজে অন্য কোথাও গেছেন।

যুবক নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের অনুসন্ধান করছেন। পুরুষ ভগবান। সর্বত্র আছেন। তাঁর প্রিয় বুদ্ধদেব এবং সাংখ্য প্রবক্তা কপিলদেব পরামর্শ দিলেন—জগতে দুঃখ, দুঃখ, পালাও, পালাও। পালাব কেন? পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার। আমি শঙ্করপন্থী-সন্নাপি অপন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি—আছে অথচ নেই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য দুঃখ আছে কি কী আছে; জুজুর ভয়ে আমি পালাই না।

কেশবচন্দ্র সেন 'ব্যান্ড অব হোপ' নামে একটি দল গঠন করলেন। নরেন্দ্রনাথ সভ্য হলেন। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলেন, ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন! না, সঠিক কোনো উত্তর মিলল না। আচ্ছা দেখা যাক দক্ষিণেশ্বরের সাধক কী বলেন! মা কালীকে নয়, উপাসক পরমহংসদেবকে দেখতে এসেছেন।

পশ্চিমের গঙ্গার দিকের দরজা দিয়ে ঢুকছেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর যুবকটিকে দেখছেন, শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই। মাথার চুল, শরীরের বেশভূষার কোনো পরিপাট্য নেই। বাইরের কোনো বস্তুতেই সাধারণ মানুষের মতো আঁট নেই। ছেলেটির সবই যেন আলগা। চোখ দেখে মনে হল, তার মনের অনেকটা ভেতরের দিকে কে যেন সর্বদা টেনে রেখেছে। দেখে মনে হল, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব।

মেঝেতে মাদুর পাতা হল। সবাই বসলেন। নরেন্দ্রনাথ গান শোনালেন, মন চল নিজ নিকেতনে। তখন চার-পাঁচটির বেশি বাঙলা গান নরেন্দ্রনাথ জানতেন না। গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাহিত। হেস্টি সাহেব ক্লাসে এই সমাধির কথাই বলেছিলেন। ট্রান্স। যদি দেখতে চাও দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে এস।

এর পরে যা ঘটল নরেন্দ্রনাথের মনে হল পাগলামি। হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের হাত ধরে ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। দরমা দিয়ে ঘেরা। দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেই নিভৃতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের বন্দনা করলেন। দু চোখে জলের ধারা। বললেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ; জীবের দুর্গতি দূর করার জন্যে শরীর ধারণ করে আবার এসেছ।' ঘরে ফিরে এসে প্রশ্ন করলেন, 'তুই কি ঘুমোবার আগে একটা জ্যোতি দেখিস?' হতচকিত নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আজ্ঞে দেখি।' ঠাকুর বললেন, 'বাঃ সব মিলে যাচ্ছে। এ ধ্যান সিদ্ধ। জন্ম থেকেই ধ্যানসিদ্ধ।' পরে বলবেন, 'নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর।' অখণ্ড মানে ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ কালী। তিনি বলবেন, ব্রহ্মের মায়া। শিবের শক্তি কালী। এইবার তাহলে বোঝা গেল, কেন নরেন্দ্র ঠাকুরের শ্বশুরঘর। তোমার অখণ্ডের ঘর সেইটাই শ্বশুরঘর। সেই ঘরেই মায়ার কোলে কোটী জীবের জন্ম।

ব্যাকুল নরেন্দ্রনাথের সেই এক প্রশ্ন—'মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের দৃঢ় উত্তর, 'হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি। আরো ঘনিষ্ঠরূপে। ঈশ্বরদর্শন হয়, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে, ঠিক যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা চায়?'

নরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন এই বোধ নিয়ে, উন্মাদ হলেও সত্যিই একজন উঁচুদরের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ একবারও তাঁকে বললেন না, যাও মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে এস। মায়ের রহস্য আর নরেন্দ্রনাথের রহস্য তাঁর কাছে জমা রইল। পরে বলবেন, ওকে জানতে পারলে এই পৃথিবীতে আর থাকবে না। নরেন্দ্রনাথ নিজের পরিচয় জানতে পারবেন আরো পরে অমরনাথ আর ক্ষীরভবানীতে গিয়ে।

সংসারে একুশটা বছর নরেন্দ্রনাথের রাজকীয় জীবন। পিতার বিপুল উপার্জন। খাওয়া-দাওয়া গান বাজনা। বিশাল পরিবার, অনেক আশ্রিত। 'প্রিন্সের' জীবন। এফ. এ. পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই ধনীর কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব। ১৮৮৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি, রাত দশটা পিতা বিশ্বনাথ হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন। আকাশ ভেঙে পড়ল। সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদ যেন অন্তরালে ছিলেন। নাতি নরেন্দ্রনাথকে বললেন যে—আর কী! যা চেয়েছিলে তাই করে দিয়েছি। সব চুরমার। ছিল প্রচুর এখন নিঃস্ব। হাঁড়ি চড়বে না। জ্ঞাতি-শত্রুরা পুরো পরিবারটিকেই রাস্তায় নামিয়ে দেবে। ফ্রম প্রিন্স টু পপার।

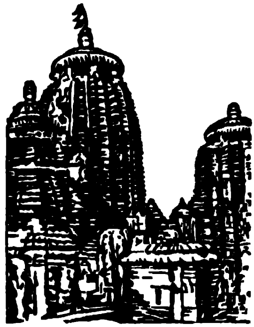
দুঃখের এই অন্ধকারে আলো দেখাবে কে। বাতি ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরকে ধরলেন নাছোড়বান্দা, 'আপনি মাকে বলে দিন। আমাদের ভীষণ অর্থকষ্ট। অন্ন কষ্ট। উপবাসে দিন যায়।'

'মাকে মানিস না যে, তাই তোর এত কষ্ট! আমি মাকে ওসব বলতে পারব না। তুই সোজা চলে যা। মাকে নিজেব মুখে বল। যা চাইবি তাই পাবি।'

অনেক ভাবে নবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বললেন, আমার আর্জিটা মায়ের কাছে পেশ করে দিন। ঠাকুর বললেন, 'তুই বলবি কী, আমি অনেকবার বলেছি, 'মা, নরেন্দ্রের দুঃখ-কষ্ট দূর কর!' তুই মাকে মানিস না, সেইজন্যেই ত মা শোনেন না। আচ্ছা আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাতে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দেবেন।'

নরেন্দ্রনাথ চলেছেন মায়ের কাছে। যেতে যেতে কেমন একটা ঘোর লেগে গেল। একটা নেশা। জগৎ ভুল। হাসি মুখে মা, দুটি হাত তুলে অপেক্ষা করে আছেন। ধাপে ধাপে সে উঠে আসছে। দুঃখের পথ মাড়িয়ে আসছে। মা ডাকছেন, আয়, আয়। হয়ে যাক শাক্তের সঙ্গে শক্তির খেলা। নরেন্দ্রনাথ প্রথম দর্শনেই বিভোর। শ্রীরামকৃষ্ণের কালী। চিন্ময়ী। প্রাণচঞ্চলা। অনন্ত প্রেম, সৌন্দর্য, করুণা। নরেন্দ্রনাথ বার বার প্রণাম করছেন, 'দাও মা দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।' উদ্ভাসিত আনন্দের পথ ধরে ফিরে এলেন ঠাকুরের কাছে। 'কি রে চেয়েছিস?' 'যাঃ, ভুলে গেছি!' 'আবার যা'। বার বার তিন বার। নরেন্দ্রনাথ এলেন গেলেন। বিষয় চাইতে পারলেন না। লাউ-কুমড়ো চাইতে লজ্জা করল। চৈতন্য ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই। এপাশে রামকৃষ্ণ-কালী ওপাশে মা কালী তিনবার আসা যাওয়া। ত্রিদণ্ডী বিশ্বাসের উজ্জ্বল উপবীত। নরেন্দ্রনাথকে ধারণ করালেন ঠাকুর। অদ্ভুত এক উপনয়ন। দণ্ডধারী, গেরুয়াধারী নরেন্দ্রনাথ প্রকাশিত হবেন বিশ্বে—বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

জহুরীই জহর চেনেন। 'জানতুম পারবি না। আচ্ছা যা, তোদের ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।' অদ্ভুত ঠাকুরের সে কি হই হই আনন্দ, 'আমার নরেন কালী মেনেছে। আবার বলেছে, আমাকে মায়ের গান শিখিয়ে দাও। শিখিয়ে দিয়েছি—মা ত্বং হি তারা।'



কোন পবনে! বাজছে বাঁশি

অনেক প্রশ্নের সেরা প্রশ্ন, আমাদের প্রাণ কোথায় আছে? বায়ুতে। আমাদের শরীরে একটা 'ক্যাপটিভ এয়ার' আছে—নিরুদ্ধ বাতাস, যার সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো যোগ নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস হল হাপর টানা। অগ্নিকে উস্কে রাখার যান্ত্রিক কৌশল। প্রাণবায়ুর খবর রাখেন ক্রিয়াযোগীরা, আর রাখেন সহজিয়া বাউলরা। আর রাখেন সুফী সাধকরা।

এই দেহ এবং এই শ্বাস। জড় দেহ নয়, চেতন দেহ। সে-দেহ কেমন? সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুফীসাধক রুমি বলছেন—Everything in the universe is within you. Ask all from yourself. 'শিবসংহিতা' আরো বিস্তারিত। পঞ্চভূতবিনির্মিত এই দেহই ব্রহ্মাণ্ড। কী রকম?

দেহেহস্মিন্ বর্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সবিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রানি ক্ষেত্রপালকাঃ।।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রানি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তন্তে পীঠদেবতাঃ।।
সৃষ্টি সংহারকর্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ।।
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বানি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে।।

কী আছে এই দেহে? সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত মেরু-পর্বত। মেরুদণ্ডসমন্বিত পর্বত-মস্তক। সাতটি চক্র তার সপ্তদ্বীপ মালা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন মনের সপ্তভূমি। এরপর নদ-নদীসমূহ, সমুদ্রসকল, পর্বতসমূহ, ক্ষেত্রসমূহ, ক্ষেত্রপালগণ, ঋষি-মুনিবর্গ, গ্রহনক্ষত্রকুল, পুণ্যতীর্থসকল, পীঠস্থানসমূহ, পীঠদেবতাগণ। এই শরীর এক আকাশ। ঠাকুর বললেন ঘটাকাশ। ঘট হল শরীর। এই শরীরেই সৃষ্টি সংহারকারী রবি-শশী

সর্বদা ভ্রমণশীল। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবী সবই এই শরীরে। ত্রিলোকে যা আছে সব আছে এই শরীরে। মেরু অবলম্বন করে যার যা কাজ করে যাচ্ছে। মেরু শব্দের সাধারণ ধারণা—Pole—উত্তর ও দক্ষিণ। দেহ মেরুর উত্তরে —**সহস্রার**। দক্ষিণে **মূলাধার**। জপমালার গ্রন্থিবীজ বা প্রধানবীজ সুমেরু।

বিজ্ঞানী অর্থাৎ জীববিজ্ঞানী অর্থাৎ 'ব্রেন' যাঁদের বিষয় তাঁরা কি ভাবে দেখছেন, the spinal cord is a never fibre, extending from the bottom of the brain throughout our body and is protected by 24 spinal vertabrae. মেরুদণ্ড হল স্নায়ুতন্ত্র। আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রে—ইড়া, পিঙ্গল, সুষুম্না। গঙ্গা যমুনা, স্বরস্বতী ত্রিধারা। extending from the bottom of the brain. বিজ্ঞানীরা ওপর থেকে নীচে নামছেন—অবরোহন। আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানীরা নিচে থেকে উপরো উঠছেন—আরোহণ। মেরুদণ্ডটিকে সযত্নে রেখেছে চব্বিশটি হাড় বা কাশেরুকা দিয়ে তৈরি দুর্দান্ত একটি আধার। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম (সি.এন.এস) ও পেরিফারেল নার্ভাস সিস্টেমকে যুক্ত করছে। (পি. এন. এস)।

কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য কারিগর
ঘরের মাপ চৌদ্দ পোয়া
চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর।। [অনন্ত গোঁসাই]

চৌদ্দ পোয়া মানে সাড়ে তিনহাত। ত্রিধারা একটি ধারা-মূল ধারা, দেহভূমিতে অজস্র শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। বাউল গানের প্রচলিত ধারায়—জমির সঙ্গে এই মানবদেহের তুলনা। রামপ্রসাদের আক্ষেপ—এমন মানবজমিন রইল পতিত। কালাচাঁদ পাগল গাইছেন,

মানবদেহ কল্পভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে।
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে
শুভযোগে চাষ করিলে।।
এই জমি তোর চৌদ্দ-পোয়া
ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া
মন্ত্র-বীজে নে সৃজে
গাছে হলে বীজ জন্মে মূলে।।

রুমির অনুভূতি, I am a tree with a trained parrot in its branches/ silence, thought, and voice. গাছের জলে শিক্ষিত তোতা, সে শুধু কৃষ্ণকথা বলে। ঠাকুর বলছেন, ভাবমুখে।

বিজ্ঞানীরা 'ইঞ্জিনিয়ারিং' নিয়ে ব্যস্ত। হাড়ের, খাঁচা, স্নায়ু, অনুভূতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুভূতি। অবোধ শিশু যেমন জিজ্ঞেস করে—ওমা ওটা কী, ওমা এটি কী? সেই রকম

The spinal cord receives information from the senses and transmits it to the brain. ঠাকুর যেমন বলতেন, সব আমার মা জানে, আমি খাই দাই আর থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণ মাথাটা কেটে মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কাটামুণ্ডের নিগূঢ় বাণী—জ্ঞান চাস্? তাহলে তোর মুণ্ডুটা আমাকে দে। আঁধাব রাতে দক্ষিণেশ্বরের পথে পথে উন্মত্ত ঠাকুর ছুটছেন আর বলছেন—আমার বিচারবুদ্ধিতে আগুন লাগিয়ে দে।

এই বিজ্ঞানে মনের অস্তিত্ব নেই। চিন্তার উৎসসন্ধানের চেষ্টা কোথায়। মনের সপ্তভূমির সন্ধান ঠাকুর দিয়েছেন। ছোরা ছুরি ছাড়াই মানুষ বহুকাল আগে তার মাথার খবর জেনেছে সাধনার দ্বারা। পায়ের পাতায় ছোট্ট একটি নিমেষে মাথা জানিয়ে দিয়েছে, ওটা হাতি নয় পিঁপড়ে। ঠিক কোনখানটায় তাও বুঝিয়ে দিয়েছে। পায়ের পিঁপড়ে হাতে খুঁজব না। দূর থেকে শব্দ আসছে। কতদূর। কোন দিকে অনুমান করতে পারব কী ভাবে? এই ভাবে ঃ

MODALITY	Stimulus(সাহায্যকাবী)	Type of Receptor(ধরন)	Receptors (নাম)
দৃষ্টি	আলো	ফটো বিসেপ্টাব	বডস এবং কনস
শ্রবণ	ধ্বনি, স্বব	মেকানো বিসেপ্টব	হেযাবসেলস্ 'ককলিযাব'
ব্যালেনস	হেডমুভমেন্টস	মেকানো বিসেপ্টব	হেযাব সেলস্ (সেমি-সার্কুলাব ক্যানালস)
সোমাটিক (দেহানুভূতি)	মেকানিক্যাল, নক্সাস, থার্মাল অ্যান্ড কেমিক্যাল	মেকানো, নোসি, থার্মো, কেমো বিসেপ্টাব	ডর্সাল রুট গ্যাংগলিআন নিউবনস
স্বাদ	কেমিক্যাল	কেমো বিসেপ্টাব	টেস্টবাডস
গন্ধ	কেমিক্যাল	কেমো বিসেপ্টাব।	অলফ্যাকটবি সেনসবি নিউবনস

নিউরোলজিস্টরা এরপর বললেন, all roads lead to Rome. অজস্র স্নায়ু ও স্নায়ু গ্রন্থি সারা শরীরে চনমন করছে। সমস্ত সংবাদ চালান করে দিচ্ছে হেড অফিসে। সব আমার মা জানেন। মা-থা, মা যেখানে থাকেন। আমাদের সাধন সংগীত ওদের অনেক আগেই সাধকের অভ্রান্ত অনুভূতিতে এই তত্ত্ব ধরে বসে আছে। 'টার্মিনোলজি' অন্যরকম, 'শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে ক্রীড়া কর কুতূহলে সচ্চিদানন্দ দায়িনী।' এই অজ্ঞাত সাধক নামের প্রত্যাশী নন, তিনি তাঁর প্রাপ্ত জ্ঞান আটটি চরণে জ্ঞাত করে গেছেন। বিরাট বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন হয়নি।

'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী'—The serpent power at the base of the spine. মাথায় না মূলাধারে? মাথা তার যাবতীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছে। যেন ময়রা,

ছানা আসছে চিনি আসছে। তৎক্ষণাৎ 'সন্দেশ' তৈরি করে 'ডেলিভারি' করে দিচ্ছে। সন্দেশের অপর অর্থ সংবাদ। উর্দুতে 'আকবর'—অখবার। জ্ঞানের ব্যাডমিন্টন।

কুণ্ডলিনী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা। একটি ত্রিকোণে অগ্নিবর্ণ অবস্থান। ছানা আর চিনি হল ঠাকুরের কলির মায়া—কাম আর কাঞ্চন। প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনী ঠাকুরের ভাষায় কড়াইয়ের জলের বেপারি। তিনি অমৃতের আধার, কিন্তু জাগাতে হবে, তুলতে হবে। কোন 'রুট'! up and higher up-to Rome-thc vatican city-লালনের আক্ষেপ,

আমার বাড়ির কাছে আরশী-নগর
এক পড়শী বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।।

মনের সপ্তভূমির সর্ব নিম্নতল মূলাধার। 'মূলাধার ত্যজ শিবে?' জাগ মা কুল কুণ্ডলিনী। সুষুম্নার পথ ধরে স্বাধিষ্ঠানে হও উদিত, চলো মা, ধাপে ধাপে ওপরে—মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রার? ঠাকুর বলছেন, 'যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। যখন সংসারে মন (নিউরোলজি নীরব) থাকে, তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি মনের বাসস্থান (তন্ত্রে এই তিনটি স্থান হল, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর)। মনের তখন উর্ধ্ব দৃষ্টি থাকে না--কেবল কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে। (নিউরোলজি অন্তত এইটুকু বলতে পেরেছে, বর্ণ স্বাদ, সঙ্গীত, 'এতই গন্ধ, এতই বরণ, এত গীতি, এত ছন্দ' আমাদের অনুভবে আসে কোন পথে? উত্তর Neural encoding and decoding.)

'মনের চতুর্থভূমি হৃদয় (অনাহত)। তখন প্রথম চৈতন্য হয়েছে (দেহাতিরিক্ত অনুভূতি)। নিউরোলজির ব্যাখ্যা—The thalamus is thc most important relay station of the senses)। আর চারদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তখন সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ দেখে অবাক হয়ে বলে, একি! একি!'

নিউরোলজিস্ট ব্যাখ্যা করুন—আপনাদের অনুসরণে, Vision→Light→Photo reception→rods, cons. ঈশ্বরের আলোর ধারণা আছে কি? Source—God.কোন চোখে দেখা যায়? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, ও চোখে হবে না সখা।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।

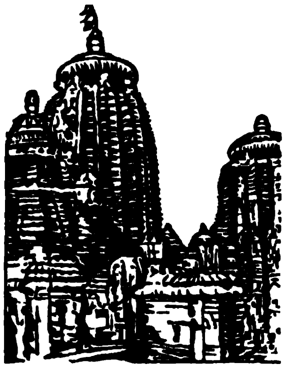
আমি তোমাকে অলৌকিক চক্ষু প্রদান করছি। মনের পঞ্চম ভূমি কণ্ঠ। (বিশুদ্ধ)। অবিদ্যা, অজ্ঞান, সব উবে গেল। মনে তখন বিশুদ্ধ চিন্তা। আনন্দময়, ঈশ্বরময়, জ্যোতির্ময়। মনের ষষ্ঠভূমি কপাল (আজ্ঞা চক্র)-নিরুপম রূপ দর্শন। ঠাকুরের অনুপম উপমা 'যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো আছে, মনে হয়, এই আলো ছুঁলাম, ছুঁলাম কিন্তু কাচ ব্যবধান।' এরপর শিরোদেশ সপ্তমভূমি(সহস্রার)-ব্রহ্মারন্ধ্রে সহস্রার হ, ল, ক্ষ

ব্রহ্মরূপিনী। সমাধি। ঠাকুর সমাধিস্থ। দণ্ডায়মান, কাষ্ঠপুত্তলিবৎ, দেহে প্রাণ নেই। মহাত্মা তোতাপুরী বুকে কান পাতলেন। হৃদয়ের শব্দ নেই। অমল জ্যোতিতে দেহ উদ্ভাসিত। নিউরোলজিতে ব্যাখ্যা নেই। এবার তাঁরাই বললেন, দার্শনিক স্পিনোজাই ঠিক ধরেছেন—মস্তিষ্ক তথ্য ও তত্ত্বের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে, উথাল পাথাল। টুকরোগুলোকে জুড়তে না পারলে সমগ্রের জ্ঞান আসবে না। খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নয়। স্বতঃলব্ধ জ্ঞানই সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং সেই বাউল—At this level, man is asware of the universe's unity; not as an observer but rather as within himself.

'রাত্নসারে' সেই সার কথা—

ভাণ্ডকে জানিলে জানি ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব।
ভাণ্ড বিচারিলে জানি আপন মাহাত্ম্য।
আপনা জানিলে জানি বৃন্দাবনতত্ত্ব।।
ভাণ্ড হইতে জানি জত কৃষ্ণের মহিমা।
ভাণ্ড হইতে জানি রাধা-প্রেমতত্ত্ব-সীমা।।

এখন লাখ টাকার প্রশ্ন, 'আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে।' কোন পবনে ভাসছে আমার নাও!



শুদ্ধ মনে জ্ঞান-চৈতন্য লাভ হয়

'মন না মত্ত হস্তী। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্যে।' মা বলছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া ঠাকুর, মা, স্বামীজী একটিও কথা বলতেন না। নিজেদের জীবন থেকে তুলে আনতেন, আদেশ, উপদেশ।

মন কেমন, চঞ্চলম, অস্থিবম। গীতায় শ্রীভগবান এই কথাই বলছেন, 'মনচঞ্চলমস্থিরম্'। ঠাকুর বলছেন, মাছির মতো। এই বিষ্ঠায় ত এই সন্দেশে। বহুরূপীর মতো ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়।

মনের এই দুর্বলতা প্রসঙ্গে মা কি সহজ-সুন্দর কথাটি বললেন। 'ঠাকুর-মা-স্বামীজী-ঘরানার' মতোই কথা। অসম্ভবকে সম্ভব করার লড়াই নয়, সম্ভবকে সম্ভব করার ফাঁক খোঁজা। মা বলছেন, মনের দুর্বলতা। 'বাবা, ওটা প্রকৃতির নিয়ম; যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমা আছে না? তেমনি মনও কখনো ভাল হয় কখনো মন্দ হয়।'

একটি ইংরেজি উদ্ধৃতি মনে আসছে—ভারি সুন্দর—A weak mind is like a microscope, which magnifies trifling things, but cannot receive great ones. দুর্বলমন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো, যত তুচ্ছ জিনিসকে বড় করে দেখে। প্রকৃত বড় জিনিস দেখার ক্ষমতা দুর্বল মনে থাকে না।

গীতায় শ্রীভগবান বলছেন,

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।

চিত্ত যার চঞ্চল, ইন্দ্রিয় যার অবশীভূত, তার আত্মবিষয়িনী বুদ্ধি বা চিন্তা হয় না। যার পরমার্থচিন্তা নেই, তার মানসিক শান্তি নেই। সে মহা অসুখী। মানুষের মন। মানুষের বিবিধ যন্ত্রপাতির অবস্থান জানা আছে। হার্ট কোথায়, লাংস কোথায়। মন কোথায়? কেউ জানে না। মনের কোনো অবয়ব নেই; অথচ আছে, ভীষণভাবে আছে।

মন আর কাল, কাল আর মায়া সবই এক। ঠাকুর বললেন, ব্রহ্মেরই মায়া, মায়ার ব্রহ্ম নয়। আবার বললেন, ভগবানের সব আছে কি-না কে জানে; কিন্তু সবেতেই ভগবান আছেন। মহাকালের তুচ্ছ ভগ্নাংশই কাল। সেই কালই সৃষ্টির উদ্ভব, সৃষ্টির লয়। উদয়-অস্ত। সময়ের ফিতে বের করে মাস, বছর মাপা। এলে আর গেলে।

সময়কে বলা হচ্ছে মনের এক বিশেষ অবস্থা। 'কালশক্তি'। দৃশ্যবস্তুর মতোই ভাঁওতা সে কি রকম? সিনেমাহলে বসে কেউ একটা ভীষণ ভাল বই দেখছেন, দুঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে গেল! মনে হল এই ত শুরু হল, এরই মধ্যে শেষ! মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শিয়রে যে-রাত জেগে আছে, সে-রাত যেন আর শেষই হতে চায় না। সুখে সময় ছোট হয়ে যায, দুঃখে বড় হয়। দুঃখের রাত শেষ হতে চায় না।

আরও আছে। ঠাকুব বলছেন, পলকে সৃষ্টি, পলকে লয়। স্বর্গে দুম্ করে একটা শব্দ হল। নন্দী ভাঙ্গ ঘুঁটছিলেন, চমকে উঠে মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল!' মহাদেব বললেন, 'পৃথিবীতে একজন জন্মালেন, তাঁর নাম রাবণ।' কথা শেষ হতে না হতেই আবার শব্দ—দুম্। নন্দী প্রশ্ন করলেন, 'প্রভু! এবার কে জন্মালে?'

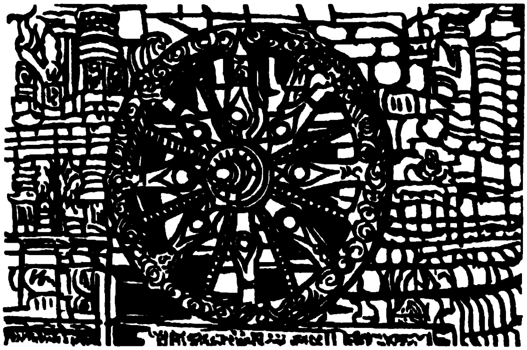
'কেউ জন্মায়নি, ওই রাবণ বধ হল'।

পৃথিবীর একটা যুগ মহাকালের পলকে গুটিয়ে এল। কালের সুতোয় জীবন ঘুড়ি, মহাকালের হাতে লাটাই। মাপ সব মনে। কল্পকে মনে হতে পাবে মুহূর্ত। মুহূর্তকে মনে হতে পারে কল্প। স্বামীজী আর একটি মাত্রা যোগ করলেন, 'মন সর্বব্যাপী। যে-কোন স্থান থেকে এর স্পন্দন শোনা যেতে পারে এবং অনুভব করা যেতে পারে।'

এক মহাসাধক বলেছিলেন, 'মনকে জয় করেছি, বিশ্ব এখন আমার পদতলে।' [আদি গ্রন্থ : জাপুজি] উত্তর ধ্যানসূত্র বলছেন—নিজেকে জয় কর। বাইরে লড়াই, জয়-পরাজয়ের কোনো মূল্য নেই। নিজের সঙ্গে নিজে লড়াই কর। নিজেই নিজেকে জয় করে অচলের সাম্রাজ্যের অটলের সিংহাসনে বসো না কেন? অনন্তকালে জীবের অনন্ত লড়াই জীবনের সঙ্গে।

মা যে সেই কথাই বললেন অতি সহজ করে আমাদের জন্যে—

'ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো কী শিং বেরোয়? না। মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে জ্ঞান-চৈতন্য লাভ হয়।'



কেউ মা বলে ডাকলে তাকে ফেরাতে পারব না

মা স্নেহময়ী, মা করুণাময়ী, শক্তিস্বরূপিণী, ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করলেই কি মায়ের পূজা শেষ হল? সেই পূজাই পূজা যে-পূজারী নিজেই পূজনীয় হয়ে ওঠেন।

ঠাকুর স্তুতি অপছন্দ করতেন। কেশবচন্দ্রকে একবার মৃদু তিরস্কার করেছিলেন।

স্বামীজী শাক্তের ব্যাখ্যা করেছেন, শক্তির উপাসকই শাক্ত। শক্তিমান হয়ে ওঠাই হল সিদ্ধি।

শক্তিমান হওয়া কাকে বলে? দেহের শক্তি? না, মনের শক্তি। মনের সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করা। ইন্দ্রিয়কে স্ব-শাসনে আনা। নিজের বোধ, বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত বিচার সব মায়ের কাছে জমা করে দেওয়া। মায়ের দ্বারা পরিচালিত হওয়া। সে অবস্থাটা কেমন? মনের সেই অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। মাকে বলেছিলেন, 'আমি কি জানি, মা? আমি কি জানি? আমাকে যা আদেশ করবেন তাই করব। জলে ঝাঁপ দিতে বলেন, জলে ঝাঁপ দেব; আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, আগুনে ঝাঁপ দেব; পাতালে প্রবেশ করতে বলেন তো পাতালে প্রবেশ করব। আমি কি জানি?'

এই সমর্পণ থেকেই ত অমিত শক্তি আসে। পূজা মানে সমর্পণ। মায়ের কোলে চড়ে বসা। শুদ্ধ মন না হলে ত হবে না। মনের ময়লা সাফ করতে হলে শক্তি চাই। সব রকমের আসক্তি ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। এইটিই সাধনা। ঠাকুর বলতেন, 'আমি খাই, দাই আর থাকি, আর সব আমার মা জানেন।'

স্বামী প্রেমানন্দ মালদায় যাবেন, মায়ের আদেশ। যাবার দিন ঠিক হয়েছে বৃহস্পতিবার। সময়, ভরা বারবেলা। একটা আপত্তি উঠল—বৃহস্পতিবারের বারবেলা। বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'মা অনুমতি দিয়েছেন, বৃহস্পতির বারবেলা আবার কীরে?'

মাকে আমরা সেই ভাবে ধরতে পারব কি? মুখে মা, মা বলে মনে অন্যভাব ভরে

রাখব। কিন্তু মা যে বলেছেন, 'কেউ মা বলে ডাকলে তাকে ফেরাতে পারব না।'

ঠাকুর জানতেন, বলেও ছিলেন, 'আমার কাছে বিচার আছে, তোমার তাও থাকবে না। তুমি সকলের মা'। ঠাকুর অন্যের স্পর্শ করা অন্ন গ্রহণ করতে পারতেন না। স্পর্শদোষ হত। সকলের প্রণাম নিতে পারতেন না, বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করতেন। কারো কারো প্রণামে মায়েরও সেই একই অনুভূতি হত। দুঃখ করে বলতেন, কারা যে সব আসে, মনের ভেতর কি ভরে! ঘটি ঘটি জল ঢাললেন পায়ে। তবু প্রণাম নিতেন। করুণাময়ী যে। পদ্মবিনোদের ঘটনা আমরা জানি। অন্তিম সময়ে পদ্মবিনোদ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' শুনতে শুনতে চলে গেলেন। দুগাল বেয়ে গড়িয়ে নেমেছে শেষ অশ্রু। মা শুনে বললেন, 'তা হবে না? ঠাকুরের ছেলে যে! কাদা মেখেছিল, এখন যার ছেলে তাঁরই কোলে গেছে।' অপূর্ব যাত্রা।

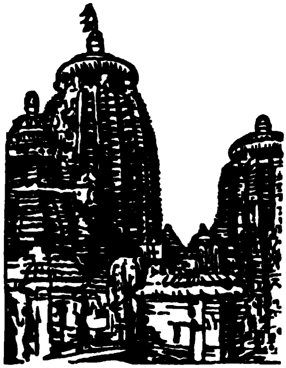
জয়রামবাটীর অদূরে গ্রাম—শিরোমণিপুর। অধিকাংশ মানুষই গরিব, কৃষিজীবী। সেই গ্রামের এক বৃদ্ধার ছেলে খুব অসুস্থ। বাঁচার আশা নেই। সন্তানের বৃদ্ধা মায়ের গভীর বিশ্বাস, মা সারদার চরণামৃত খেলে সুস্থ হয়ে উঠবে। যেমন কলকাতার গিরিশবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, তাঁর ছেলে দানিকে ঠাকুরের শ্রীচরণধৌত জল খাওয়ালে দুরারোগ্য অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

শিরোমণিপুরের বৃদ্ধা জননী মায়ের কাছে কেঁদে পড়লেন। মা তাঁকে চরণধৌত জল দিতে রাজি হলেন। গেলাসের জলে বুড়ো আঙুলটির ডোবাতে যাবেন, এমন সময় জনৈক ভক্ত এসে বাধা দিলেন। বৃদ্ধাকে বললেন, 'তুমি ছেলের চিকিৎসা করাও মার-পা-ধোওয়া জল পাবে না।'

বৃদ্ধা জননীর আশাহত মুখের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, 'তুই মা চুপিচুপি এলি না কেন, তাহলে তো পেতিস। ছেলেরা এখন সব জেনে ফেলেছে। এখন উপায় কী?' বৃদ্ধার করুণ মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আমি বলছি, তোর ছেলে সেরে উঠবে।'

হতাশ বৃদ্ধা সে-কথা বিশ্বাস করতে না পেরে ঠুকঠুক করে বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়িতে ঢুকে তিনি হতবাক—এ আমি কি দেখছি। মরণাপন্ন ছেলে হাসিহাসি মুখে ঘরে পায়চারি করছে।

বিশ্বাস! মাকে বিশ্বাস। স্তুতি নয়। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।



গুরু কৃপা হি কেবলম

বৌদ্ধবা একটা কথা বলেন, জীবনকে বেড়ার ওধার থেকে দেখ। নিজেকে বাইরে রাখ, তাহলে সত্যকে দেখতে পাবে সত্যের পবিপূর্ণ সামগ্রিকতায়। এই প্রসঙ্গে দুটি ইংরেজি লাইন মনে পড়ছে, যা এই লেখকের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক,

When you are an anvil, hold you still,
When you are a hammer, strike your fill.

যে-জীবন ধর্মাশ্রয়ী তাঁদের আমবা ধার্মিক বলি। এই পথে যাঁরা সব ত্যাগ করে মানব সংসারে আলোকবর্তিকার মতো অবস্থান কবেন তাঁদের আমরা সাধক বলি। সাধক আর তাঁর সাধনা একটা পথ ধরে চলে। সে-পথে, সেই সিদ্ধির পরিচয় আমরা জানি। বরং যেটি আমরা জানতে চাই, সেই আলোকে কে কতটা আলোকিত হলেন।

আমরা বলি কৃপা। কৃপা কাকে বলে, কোন পথে কি রূপে সেই কৃপা আসে। গুরু আর ঈশ্বর এক। গু শব্দের অর্থ ধর্মের আলো, রু শব্দের অর্থ দান। ধর্ম কি দান করা যায়! ধর্ম ত কর্ম। কবে পাওয়ার নাম কৃপা। ধর্ম করতে হবে, তবেই ত ধর্ম আমাকে ধারণ করবে। আমি এক পা এগোলে ধর্ম আমার দিকে একশো পা এগিয়ে আসবে।

জীব আর ঈশ্বর, তুলনাটা কেমন হবে, ঈশ্বর হলেন চুম্বক, জীব হল লোহার পেরেক। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন চুম্বক ত লোহাকে টানবেই, লোহাও চুম্বককে টানে। উপযুক্ত সদগুরু ধর্মদান করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, গুরু যেন সেথো। শিষ্যকে ঈশ্বরের কাছে পৌছে দিয়ে সরে আসেন।

শঙ্করাচার্য বলছেন,

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং
সমারাধ্য ভক্ত্যা বিচার্য্য স্বরূপম্।

যদাপ্রোতি তত্ত্বং মিদিধ্যাস্য বিদ্বান্
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ।।

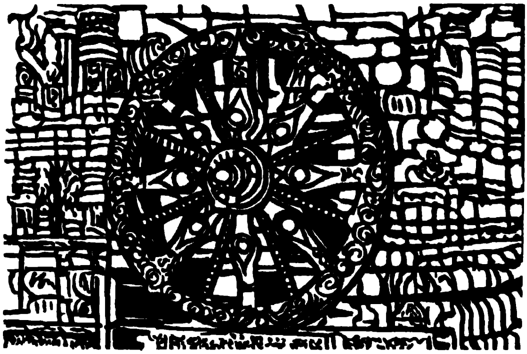
ভক্তি ও আরাধনা। দয়ার্দ্র প্রশান্ত ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর আরাধনা। তারপর স্বরূপ বিচার ও নিদিধ্যাসন। নিদিধ্যাসন কাকে বলে, অনুসন্ধেয় বিষয় শ্রবণ ও মনন। ধীরে ধীরে নিঃসন্দেহ হওয়া। এরপরে আসবে নিষ্ঠা। 'পঞ্চদশী' বলছেন, 'অভ্যাং নির্বিচিকিৎসেহর্থে চেতসঃ সংস্থাপিতস্য যৎ। একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে!' শ্রবণ এবং মননের দ্বারা মন নিশ্চিত বিশ্বাস লাভ করে। সেই মন তখন আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। সেই মনের ধরন তখন হয় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানমগ্নতা।

ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর আরাধনা। আরাধনার দুটি রূপ—বাহ্যিক ও আন্তরিক স্বামী অখণ্ডানন্দজী একভক্তকে লিখছেন, 'মূর্তি-চিন্তার সময় মনে রাখিও, গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন। তোমার ইষ্টের মূর্তির সর্বদা ধ্যান করিবে এবং জানিবে—ঐ মূর্তির মধ্যেই তোমার গুরুর মূর্তিও নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু কখনোই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিধ্যান করিবে না।

'জপ, ধ্যান, ইষ্ট চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে কখনোই গুরু ভিন্ন অন্য লোকের সঙ্গে আলোচনা করিবে না। নানা লোকের নানা কথায় ভক্ত সাধকের মনে দ্বিধার সঞ্চার হয়, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা শিথিল হইয়া পড়ে।'

দুটি সমান্তরাল সংস্কারধারা আমাদের মধ্যে গ্রথিত হয় দীক্ষান্তে। গুরুর গুরুপরম্পরা, সাধনধারা আর নিজের বংশগতির ধারা। সংস্কারই জীবনধারা ও ধরনের রূপকার। কে জন্মায় মানুষের রূপ ধরে? বিভিন্ন সংস্কার। বৌদ্ধমতে, জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, তিনটি অবস্থাই এক একটি 'বার্দো'। 'The word 'Bardo' is commonly used to denote the intermediate state between death and rebirth, but in reality bardos are occuring 3continuously throughout both life and death, and are junctures when the possibility of liberation or enlightenment is heightened.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বারে বারে বলছেন, সংস্কার তৈরি করো। শুভ সংস্কার। সেটি সঞ্চিত হবে মূলাধারে। তুমি যখন আবার আসবে তখন তুমি আরো উন্নত মানুষ হবে।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

এই সেই বাড়ি? ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতে-নামতে ঠাকুর প্রশ্ন করলেন। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ তাঁকে অতি সাবধানে নামাচ্ছেন। ঠাকুর ভাবস্থ। শ্রাবণের বিকেল। আকাশে বাদলে মেঘের আনাগোনা। দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন বেরোলেন তখন কত আনন্দ! কত কথা! আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়া মাত্রই ভাবান্তর। আত্মমগ্ন।

ইংরেজি স্টাইলের দোতলা একটি বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমদিকে সদর দরজা ও ফটক। কিছু কিছু ফুলগাছ এদিকে ওদিকে। বর্ষার ফুল ফুটে আছে। ঠাকুর ভেতরে প্রবেশ করি⁻⁻ন। ভক্ত পরিবৃত হয়ে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে নিজের জামার বুকে হাত রাখলেন। তারপর বালকের সরলতায় মহেন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ গো আমার বোতাম যে খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না ত?'

অপূর্ব ঠাকুরের সাজ। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, তার আঁচলটা কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্নিশ করা চটি জুতো। মহেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি ওর জন্য ভাববেন না। আপনার কিছুতে দোষ হবে না, আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।' বালকের মতোই নিশ্চিন্ত হলেন। ঈশ্বরের সরলতা।

সামনেই সিঁড়ি। ধাপে ধাপে উঠে গেছে সেই জ্ঞানলোকে। যেখানে বসে আছেন এক শ্রেষ্ঠ বাঙালী। ঠাকুর তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আড়ম্বরহীন পরিবেশ। তাঁর সামনের টেবিলে বাঁ হাতটি রেখে, ভারি মিষ্টি গলায় বললেন, 'আজ সাগরে এসে মিললাম।'

ঈশ্বরচন্দ্র সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছেন। উনবিংশ শতকের দুই বিদ্রোহী মুখোমুখি। মাঝখানে একটি টেবিলের ব্যবধান। ঠাকুরের মুখে স্বর্গীয় হাসি। একজন সমাজকে, আর একজন ধর্মকে পথে আনতে চাইছেন। দু'জনেরই সংগ্রাম, দারিদ্র আর অজ্ঞানের অন্ধকারের বিরুদ্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষ্কার বলে দিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' আর ঈশ্বরচন্দ্রের অকাতর দান, পরোপকার আর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেহাদ। দু'জনেই

রসিক।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি, সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে রসিক বিদ্যাসাগরের প্রত্যুত্তর, 'তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান।'

দু'জনেই হাসছেন। শ্রোতারা অপেক্ষা করে আছেন রসিক ঠাকুর কি উত্তর দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অসাধারণ উত্তর, 'না গো! নোনাজল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র।'

শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি শব্দ প্রায়ই প্রয়োগ করতেন, বিদ্যা আর অবিদ্যা। প্রথমটা 'পজিটিভ', দ্বিতীয়টি 'নেগেটিভ'। ভাল আর খারাপ। আলো আর অন্ধকার। স্বাদু আর কটু। চাঁদের এপিঠ, চাঁদের ওপিঠ। আকাশে দু' ধরনের তারা আছে। উজ্জ্বল আর অন্ধকার। কালো তারা, 'ব্ল্যাক হোল'। সব গ্রাস করে নেয়। আলো, সময় বস্তু সব গিলে ফেলে। রাহু। বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার অসাধারণ এক দলিল। যেন প্লেটো আর সোক্রাতেস মিলিত হয়েছেন এক টেবিলে, বর্ষার বিকেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।'

ঈশ্বরচন্দ্র ধর্মের জগতের মানুষ নন। মন্দিরের ধর্ম সম্পর্কে তাঁর তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে উদার ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের হাতে তুলে দেবেন, সেটি এক লাইনের একটি শাস্ত্র—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামীজী যাকে আর-এক ভাবে বলবেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। ঈশ্বরচন্দ্র গম্ভীর মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, উচ্ছ্বাসহীন নীরব সেবক। তিনি সেবা আর দয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করেননি। মাতৃভক্ত। মায়ের জন্যে জীবন দিতে পারতেন। পরোপকার ও পরের দুঃখ দূর করার জন্যে সর্বস্ব দান করে গেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও স্বামীজীর মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কোমল প্রেমের পরত। এ-পাশে জ্ঞান, ও-পাশে জ্ঞান, মাঝে, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস। তিনজনেই মাতৃভক্ত। মায়ের ভক্তই তো প্রকৃত শাক্ত।

জ্ঞানের সাগর, বিদ্যার সাগরের কাছে জ্ঞানের কথাই ত বলতে হবে। স্বামীজী বললেন, বেদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার পরমহংসদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের বাবা। ঠাকুর সাধারণের কাছে পরিষ্কার একটা সমাধান তুলে ধরেছেন। জগৎকে 'মায়া' বলে উড়িয়ে দিয়ে, 'নাকে নস্য ঠুসিয়া, টিকি নাড়িয়া, তর্ক করিয়া, পরিবারের সংখ্যা অবিরত বৃদ্ধি করিয়া 'সোহং' হুঙ্কার ছাড়িলে লোকে সিটি মারিবে'। ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। সে

কি রকম? একটি প্রদীপ জ্বলছে। আলো দেওয়াই তার কাজ। সেই আলোয় কে কী করছে, তা দেখা তার কাজ নয়। এ-ঘরে কেউ ভাগবত পড়ছে। আর এক ঘরে একজন দলিল জাল করছে। নির্বিকার প্রদীপ জ্বলছে।

'সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।'

'সাপের দাঁতে বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায় সাপের কিন্তু কিছু হয় না।'

'দেখো ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র ব্রহ্মাই উচ্ছিষ্ট হয়নি, কারণ মুখে বলা যায় না।'

বিদ্যাসাগরমশাই, আহা! করে উঠলেন, 'একটা নতুন কথা শিখলুম আজকে।'

চীন প্রাচীন সভ্যতা। ভারতের মতোই। জগৎ, জীবন, ভগবান তিনটে এক করে নাও। সৃষ্টির দিকে তাকালেই স্রষ্টাকে দেখতে পাবে। কনফুসিয়াসের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই কথা বলেছেন লাওৎসু। এই জগৎ এক শক্তির দ্বারা পরিচালিত। উৎস, আমরা বলব, ভগবান। কেউ বলবেন গড। কেউ আল্লা। চৈনিক লাওৎসু বলবেন 'তাও'।

ধর্ম মানুষের জীবন, জগৎ, সমগ্র এই সৃষ্টিকে ধরে রেখেছে। তা না হলে সব ধ্বংস হয়ে যেত। লাওৎসু তাঁর দর্শন ও চিন্তায় এই সত্যটি পেলেন, 'সেই মহাশক্তি তাও তারই তৈরি বাঁধাধরা নিয়মে এই জগৎ শাসন করছেন ঠিকই, তবে মানুষকে দিয়ে রেখেছেন স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি। মানুষ। এই ইচ্ছার স্বাধীনতা অথবা স্বাধীন-ইচ্ছা তোমার এক পরম সম্পদ। শান্তির সাধনা করো, আর তুমি কি করবে আর করবে না, তোমার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্তে এসো।'

তিন মহাপুরুষের ভাবনাই এক পথে গেছে, প্রেম, শান্তি, ক্ষমা আর পরোপকার। এই তিনজন হলেন, লাওৎসু, গৌতম বুদ্ধ আর যিশুখ্রিস্ট। খ্রিস্টের 'শৈল-উপদেশ', 'বুদ্ধবাণী' আর 'তাও' একই সুর তিনটি তারে। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যবাসীকে প্রেমের বাণী শোনালেন বেদান্তের আলোকে।

লাওৎসু বললেন, তোমার নিপীড়নকারীকে ক্ষমা দিয়ে শান্ত করো, নিজেকেও শান্ত করো। যে মন্দ তাকে আমি নিজে ভালো হয়ে ভালো করব। মারের বদলে মার, এই নীতিতে সমাজ চললে পৃথিবীতে মারামারি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এত সুন্দর পৃথিবীটাকে নষ্ট করে ফেলবে?

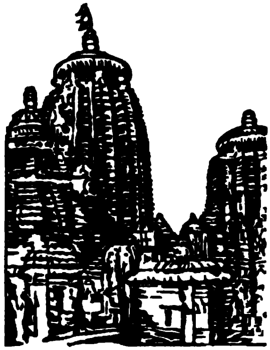
ঈশ্বর সুন্দর তাঁর সৃষ্টি সুন্দর। সেই সুন্দরকে অনুভব করতে চাও, তাহলে পবিত্র হও। নিজেকে জাগতিক কামনা, বাসনা থেকে মুক্ত করো। ভগবানের ঐশ্বর্য চাইলে ভগবানকে পাবে না কোনওদিন। তাঁর বাইরেটা দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ভগবান

আর জগৎ আলাদা নয়। পরস্পর জড়িত। আমরা তা মনে করি না। মনে করি দুটি আলাদা। এটা একটা ওটা একটা। দুটো যে আলাদা নয়, এইটাই এক মহা রহস্য। শুধু রহস্য নয়, রহস্যের রহস্য।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণর সুন্দর উপমা, বেল আর বেলের বিচি। 'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ 'নেতি নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয়—ঈশ্বর, মায়া, জীব-জগৎ। জীবজগৎসুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা শাঁস, বিচি আলাদা করা যায়, আর একজন বলে, বেলটা কত ওজন ছিল দেখ তো, তুমি কি খোলা বিচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না, ওজন করতে হলে খোলা বিচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এত ওজনের ছিল। খোলাটা যেন জগৎ, জীবগুলি হল বিচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচাব করার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বিচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয়, যে সত্তাকে শাঁস, সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বিচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে।

লাওৎসুর তাও আর হিন্দুর ব্রহ্ম এক। লাওৎসু বললেন, স্বর্গ আর মর্ত একই উদরে জন্মাল। তিনি আমাদের মা। ত্বং হি তারা। বিশ্বপ্রসবিণী মা। জগৎ অধিশ্বরী। জগদিশ্বরী, লাওৎসুর কী অপূর্ব সিদ্ধান্ত! আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি চলেন, তাই তিনি বর্ণহীন। তিনি আমাদের শ্রবণকে পাশ কাটিয়ে যান, তাই তিনি শব্দহীন নিঃশব্দ। তিনি আমাদেব স্পর্শকে ফাঁকি দিয়ে যান, তাই তিনি কায়াহীন। এই অশরীরী উর্ধ্ব আর অধঃ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। উপর দিকটা আলোকিত উজ্জ্বল, নিচের দিকটা অন্ধকারে অস্পষ্ট, তা নয়। অবিরত, অবিরল ক্রিয়াশীল। কোনও একটি নামে তাঁকে চিহ্নিত করা যাবে না। এই সব আছে পরমুহূর্তেই কিছু নেই, কেউ নেই। নিমেষে সৃষ্টি নিমেষে ধ্বংস। Form of the formless,the image of the imageless.

কে তুমি? আমিই বা কে?



যে রামকৃষ্ণের ছেলে

'যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না।' স্বামীজি বলছেন, 'প্রাণাত্যয়েদমি পরকল্যাণচিকির্ষবঃ' তারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। এই হল রামকৃষ্ণধর্মের মূল কথা। নিজের মোক্ষ চাইছ, না কর্তব্য থেকে পালাতে চাইছ? ভাল করে ভেবে দেখ। কর্ম ছাড়া ধর্ম থাকে কী করে! দেহ যখন ধরেছ, শ্বাস-প্রশ্বাস আছে। নাকটা টিপে ধরলে গেল গেল অবস্থা। ইন্দ্রিয়ের ফোকর দিয়ে সংসার, জগৎজীবন দেখছ। হাসছ, কাঁদছ, ক্ষেপছ, ক্ষেপাচ্ছ, 'আমি, আমার' বলে সব আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছ, কোন্ আক্কেলে তুমি পনেরো মিনিট জপের মালা ঘুরিয়ে পরমহংস হয়ে গেলে ভাব! অতই সহজ! আষ্টেপৃষ্ঠে তিলকসেবা করে গলায় কেজি দশেক হরেকরকম মালা পরে হরিণের ছালে বসে থাকলেই হিরণ্যগঃ। সহাসে এসে যাবেন, কি দু চ্যাপ্টার গীতা পড়লেই তাঁর আলোয় আলোকময় হয়ে যাবে এমন কোনো আশা নেই। ধর্ম মানে শাস্ত্রপাঠ, তত্ত্বকথা কিংবা মতবাদ নয় ধর্ম মানে 'হওয়ার চেষ্টা করা' এবং 'হয়ে যাওয়া'। It is being and becoming.

এ যে তাঁর গুরু পরমহংসদেবেরই শিক্ষা। তিনি বলতেন, 'পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে। কিন্তু পাঁজি নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না, তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্ম কথা লেখা আছে শুধু পড়লে ধর্ম হয় না। সাধন চাই।'

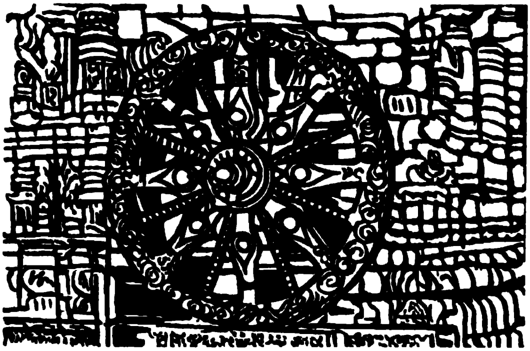
মহামান্য কেশবচন্দ্র সেন জিজ্ঞেস করলেন, 'পরমহংসদেব, অনেক পন্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানলাভ হয় না কেন?' ঠাকুর বললেন, 'যেমন চিল শকুন অনেক উঁচুতে ওড়ে কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গো ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে?'

দুটো কীটকে যে আগে পোড়াতে হবে—কাম আর কাঞ্চনে আসক্তি। রাম আর কাম, দিন আর রাত এক সঙ্গে থাকে কী করে! ওই দুটি প্যারাসাইট এর জায়গায় আনতে হবে বিবেক আর বৈরাগ্য। বললে, ভাল ভাল জিনিস খাচ্ছে, দাচ্ছে, ছেলেটার গায়ে

গন্তি লাগছে না কেন, কেবল পেটটাই বড় হয়ে যাচ্ছে। বৈদ্য এসে বললেন, লাগবে কী করে, এর যে পেটজোড়া পিলে, পিলেতেই সব খেয়ে নিলে। পিলের স্বাস্থ্যই ভাল হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি-গাঁট বিবেক-বৈরাগ্যের সঙ্গে বই না পড়লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা আর অহঙ্কারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মিলনে তৈরি হল ভয়ঙ্কর এক ধর্ম—'মরণ ধর্ম'। আমিটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অনেকটা, নিজেকে চিতায় চড়ানো। গোখরোর ছোবল। কাঁচা আমি বৈরাগ্যের আগুনে পুড়ে পাকা আমি হবে। কাঁচা সোনাকে পাকা করা। উপাধি পোড়ার পড়পড় শব্দ নিজেরই কানে শোনা যাবে।

গঙ্গার ধারের নিরালা এক উদ্যানে, জানবাজারের রানীর দেবালয়ে জমিদার মথুরামোহনের পাঁচটাকা মাসোহারায়, জপ, ধ্যান, পূজা, শাস্ত্রকথা, সঙ্গীতের গতানুগতিক পথে ধর্ম-জীবন কাটানো নয়। কী অসম্ভব রোখ! কে রাসমণি, কে মথুর, কলকাতায় মাথাঅলা জ্ঞানী গুণী ধর্মপ্রচারক, লেখক, আমলা, মুৎসুদ্দি, ব্যবসায়ী, ধনী ব্যক্তিরাই বা কে! দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ বেপরোয়া। একবার করে বাজান আর বাতিল করে দেন। তোমার পুঁথি পড়া জ্ঞানের অহংকার নিয়ে এস, তোমাকে আমি চুপসে দোবো। জ্ঞান কাকে বলে। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নাম অজ্ঞান। নাচো কাঁদো, ডিগ্রি ডিপ্লোমা, সেমিনার বক্তৃতা, মামলা, মকদ্দমা, চালবাজি, ফেরেববাজি ভেকধারণ, শাস্ত্র আলোচনা সব ফুঃ। ক্ষণকালের ফুৎকার। অজ্ঞানের অন্ধকারে ভূতের নৃত্য। জ্ঞান হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। ধর্মের পথ ঈশ্বরের দিকেই গেছে। সে পথ বাইরে নেই ভেতরে। নিজের দিকে এগনোর নামই সাধনা। তারই নাম তীর্থযাত্রা। স্বামীজীকে দিয়ে বলালেন, 'ভগবানের দিকে যাবার পথ সাংসারিক পথের ঠিক বিপরীত। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।'



নাহং নাহং তুঁহুঁ তুঁহুঁ

আমি থেকে তুমিতে যাব কী ভাবে! একটা সেতু তো চাই! ব্যবধান কী খুব দুস্তর! না, এপাশ আব ওপাশ, কিন্তু সংসার নামক এক ভ্রান্তি আমাকে বোধ করাচ্ছে, বিশাল এক পরিখা। গভীর জল, হাঙর আর কুমির কিলবিল করছে। সাঁতরে পার হব, সে উপায় নেই। লাফ মারবো? যদি পড়ে যাই। সংসারীর আমি ভীতু। সংসারীর আমি হল রেশমের গুটি। কামনা-বাসনার সিল্কের সুতো জড়িয়ে জড়িয়ে গুটি তৈরি করেছে। কেটে বেরোতে পারে, বেরোবে না। এই দিক্‌টা নিশ্চিত ও-দিকটা অনিশ্চিত। এ দিকের ছকটা চেনা, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, বেদনা, বিরহ, আসা, যাওয়া, ভোগ, দুর্ভোগ। চেনা দুঃখ, অচেনা সুখের চেয়ে ভালো। চেনা মৃত্যু, অচেনা অমরত্বের চেয়ে প্রার্থিত। এই ভাবেই সবাই আছে, এই ভাবেই চলে যায়। তোমাতে তুমি থাক, আমাতে আমি নিয়ে আমি আছি বেশ।

কেন এমন বোধ হচ্ছে। নিত্য ছেড়ে অনিত্য নিয়ে মেতে থাকা! কেন এই উটের দশা! কাঁটা গাছ মশমশ করে ছিঁড়ছি, দুকষ বেয়ে রক্ত ঝরছে! তবু, তবু চিবোচ্ছি! আপনি বলতে পারেন ঠাকুর, কেন এমন হচ্ছে!

পারি। মায়ার কারসাজি। কামিনী কাঞ্চনই মায়া। ওর ভেতর অনেক দিন থাকলে হুঁশ চলে যায়—মনে হয় বেশ আছি। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয়—বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। এই বেহুঁশ হয়ে থাকাটাও সংস্কার। বেহুঁশের সংস্কার নিয়ে এলে হুঁশ আসবে কোথা থেকে। ঠাকুর বললেন, একটা গান শোনা,

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥
বিল করে ঘূর্নিপাতে মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে॥

পালাবে কী করে! না পালানোটাই যে সংস্কার ঢুকে আছে। সংসারে সংসারী, বিষয়ী মানুষের মধ্যেই আমাদের জন্ম-কর্ম। জ্ঞান হওয়া তক বিষয় বিষ গেলানো হচ্ছে তিল তিল করে। সে বিষয়ী নয়, তার অর্থ সে অপদার্থ, বাউন্ডুলে। ধিক্কারের পাত্র। অবশ্য এটাও ঠিক, ঈশ্বর ভাবনার বুঁদ হওয়ার কারণে একজন সংসার বিষয়ে উদাসীন, আর অলস্যের কারণে উদাসীন, এই দুই উদাসীর মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। দুই দলের দুই জাতের মানুষকে একই ধারায় ফেলা যাবে না। যার সংস্কারে ঈশ্বর আছেন তাকেও এই ভোগবাদী শিক্ষায় ফেলে দিলে তার জীবন দরকচা মেরে যাবে। অজ্ঞান শিশুটিকে দেখে কে বুঝবে, সে ভোগী না যোগী হবে। অথচ তার প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা না দিতে পারলে সবই পণ্ডশ্রম। স্বামীজী বলছেন, 'আপনাবা একটি গাছকে কখনই শূন্যের উপর অথবা উহার পক্ষে অনুপযোগী মৃত্তিকার উপর বসাইয়া ফলাইতে পারেন না। যেদিন আপনারা শূন্যের উপর গাছ জন্মাইতে সমর্থ হইবেন, সেইদিন আপনারা একটি ছেলেকেও তাহার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া জোর করিয়া আপনাদের ভাব শিখাইতে পারিবেন।'

মানুষের প্রকৃতিও মানুষের শিক্ষা। আগে প্রকৃতি পরে শিক্ষা। প্রকৃতি একটি জটিল ব্যাপার। প্রকৃতির অনেক দিক। নৈতিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, তামসিক, রাজসিক। একজন মানুষ বিজ্ঞান ভালবাসবে, না কলা, এটা যেমন তার প্রবণতা, সেই রকম সে সৎ হবে না অসৎ, একটি তার প্রকৃতি। নিষ্ঠুর অথবা প্রেমিক, নির্ধারণ করবে প্রকৃতি। প্রকৃতি অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দুষ্ট প্রভাব থেকে বালকটিকে দূরে রাখতে পারলে চরিত্রের ধরন পাল্টায়। একটি প্রচলিত প্রবাদ, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে নরকবাস। গীতায় ভগবান বলছেন,

ধ্যায়তো বিষয়ান্, পুং সঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধহভিজায়তে।।

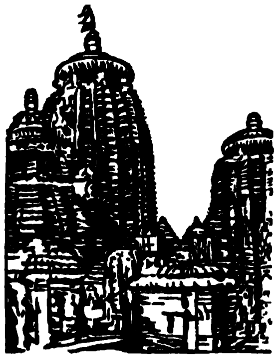
বিষয়ীদের সঙ্গে কেবলই বিষয় চিন্তা, সেই চিন্তা থেকে আসক্তি। আসক্তি থেকে পাওয়ার ইচ্ছা। এই কামনা প্রতিহত হলে ক্রোধ। ক্রোধ-এর পরিণতি

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।

প্রণশ্যতি মানে মৃত্যু নয়। মনুষ্যত্ব নাশ হয়, পশুতে পরিণত হয়। মানুষের পক্ষে সেইটাই তো বিনাশ। ক্রোধে মানুষ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়। তখন তার কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান থাকে না। হিতাহিত বোধ লুপ্ত হয়। আধুনিক যুগে আর একটি উপসর্গ জুটেছে—ফ্রাসট্রেসান। ক্রোধের জায়গায় হতাশা। ওর সব হয়ে গেল, আমার কিছু হল না। একজন রেসে হেরে গিয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে কেবল একটি কথাই বলত,

লক্কা, লাখ, ফক্কা ফাঁক। হতাশা থেকে চাপা ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসা। সামান্য উস্কানিতেই সংঘবদ্ধ ভাঙচুর, নিষ্ঠুরতা, অকারণে খুন, পিটিয়ে হত্যা।

স্বামীজি বলছেন—" 'মানুষ' কথাটি সংস্কৃত 'মন' ধাতু থেকে সিদ্ধ—সুতরাং ওর অর্থ মননশীল অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী—কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণশীল প্রাণী নয়। ধর্মতত্ত্বে এই ক্রমবিকাশকেই 'ত্যাগ' বলা হয়েছে।"



দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের আমলে যেভাবে কালীপুজো হত, এখনও কি সেভাবেই হয়?

'রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য'—এই মন্ত্রে পূজারী চতুর্দিকে জল ছড়ালেন। আসনে যে পূজারী বসে আছেন তিনি সামান্য নন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ। অঙ্গন্যাস করন্যাস পূজার সমস্ত অঙ্গ তিনি একে একে সম্পন্ন করছেন। সাধারণের থেকে তফাত এই—শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন তাঁর সর্ব অঙ্গে সমস্ত মন্ত্রবর্ণ যথাযথা স্থানে উজ্জ্বল অগ্নিরেখায় ফুটে উঠছে। দেখছেন সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না পথে ধীরে ধীরে সহস্রারের দিকে উঠছে। আর এই শক্তি যে যে অংশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, শরীরের সেইসব অংশ হয়ে যাচ্ছে নিঃস্পন্দ, অসাড়, মৃতবৎ। একে একে মূলাধার গেল, গেল স্বাধিষ্ঠান, গেল মণিপুর। শুধু ফুটে উঠল সহস্রারের শতদল। রং এই মন্ত্রে গর্ভমন্দির থরথর করে কেঁপে উঠল। পূজারীকে বেষ্টন করে জ্বলে উঠল শত জিহ্বা বিস্তার করে অগ্নিপ্রাকার। সামনে বেদিতে মা ভবতারিণী যেন খিলখিল করে হাসছেন।

ঠাকুর একান্ত অনুরাগী ভাগিনেয় হৃদয় আড়াল থেকে দেখছেন মাতুলের পূজা। মন্দিরের আরো অনেকে আছেন। তাঁদের গা ছমছম করছে, ভয় করছে। আসনে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে তখন আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর সমস্ত শরীর থেকে অদ্ভুত একটা তেজ অদ্ভুত একটা তাপ, অদ্ভুত একটা জ্যোতিঃ বেরচ্ছে।

হৃদয় পরে ভক্তদের বলেছিলেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করে পূজা করতে বসেছেন। ঠাকুরের পূজা একটা দেখবার বিষয় ছিল। যে দেখত সে-ই বাক্যহারা হয়ে যেত। পূজার আগে তিনি মা-কে গান শোনাতেন। সেখানে কালোয়াতি থাকত না। থাকত না কোনো ঢং ঢাং। গানের বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ ঢুকে যেতেন। গানের ভেতরে বসে তিনি গান গাইতেন। যেমন অপূর্ব কণ্ঠস্বর সেই রকম তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। তিনি মাকে গান শোনাতেন, মানুষকে নয়। তাই তাঁর 'সুরগুলি চরণ পেত'

আর সেই চরণ ছুঁয়ে শ্রোতাদের কানে ফিরে আসত। হয়ে যেত সাপুড়িয়ার সাপ খেলানো বাঁশি।

রানী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসতেন তখন ঠাকুরকে অনুরোধ করতেন—'বাবা গান শোনাও'। রানীর যে গানটি সবচেয়ে প্রিয় ছিল সেই গানটি হল—

কোন হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে।
জেনেছি জেনেছি তারা,
তারা কি তোর এমনি ধারা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে।।

গায়কও অঝোরে কাঁদছেন শ্রোতাও অঝোরে কাঁদছেন।

ঠাকুরের পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল সঙ্গীত। সেইসব সঙ্গীতের রচয়িতারা ছিলেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ। এঁরা সকলেই ছিলেন মহা মহা কালীসাধক। তাঁদের গীত ছিল মায়ের সঙ্গে ভাবের কথা। হৃদয় বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন পূজা করতেন তখন এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে আশেপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলাবলি করলেও তিনি শুনতে পেতেন না। তিনি তখন অন্য জগতে।

ঠাকুরের দাদা রামকুমার কামারপুকুর থেকে ভাইকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। তাঁরা দুজনে প্রথম এলেন নাথের বাগানে। এই নাথের বাগানের অবস্থান, কলকাতার শোভাবাজারে। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন সতের। দুভাই কলকাতায় এসেছেন ভাগ্যের সন্ধানে। ইংরেজের কলকাতায় বড়লোকদের মহাদাপট। রাজা, মহারাজারা চৌঘুড়ী হাঁকিয়ে ঘুরছেন। ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ খুলে সংস্কৃত শিক্ষা ও চর্চায় উদ্যোগী হয়েছেন। এদিকে, ওদিকে টোল খোলা হচ্ছে। সংস্কৃত পণ্ডিতদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। কামারপুকুরের সংসার বড় হচ্ছে। দাদা রামকুমার উপার্জনের আশায় গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে। নাথের বাগানে কিছুদিন থাকার পর রামকুমার এলেন ঝামাপুকুরে। ঠিকানা, ৬১ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট। বাড়ির মালিক, গোবিন্দ চাটুজ্যে। একতলা বাড়ি, পুরনো বাড়ি। এখানে রাস্তার ওপর রাধাকৃষ্ণের মন্দির। সেই মন্দির আজও আছে। তখন এই মন্দিরের বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দবাবুর বাড়ি থেকে পূজা পেতেন। অদূরেই ১ নং ঝামাপুকুর লেন। সেই প্রাসাদটি হল রাজা দিগম্বর মিত্রের রাজবাড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণকে আনার প্রায় চার বছর আগেই রামকুমার কলকাতায় তাঁর ভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। রাজবাড়ির কাছেই একটি টোল খুলেছিলেন। তিনি জ্যোতিষ আর স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ছাত্রদের পড়াতেন। রাজবাড়ি ও অন্য কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে নিত্য দেব-সেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এত কাজ একা সামলাতে পারছিলেন না রামকুমার। ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ, তখন তিনি গদাধর, দাদাকে সাহায্য করার জন্যে এলেন। শক্তি পূজা না জানলেও অন্য পূজায় পারদর্শী। পূজা তিনি ভালবাসেন।

কামারপুকুরের গৃহদেবতা রঘুবীরের নিত্য পূজা তিনিই করতেন। নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, নরম, কোমল, প্রেমিক দেব-দেবীর পূজা গদাধর ভালই পারেন। বিধি আর ভাবের মিলনে সে-পূজা অতি অসাধারণ। রামকুমার তাঁর দায়িত্ব দু-ভাগ করে নিলেন। নিজেকে রাখলেন টোলে অধ্যাপনার কাজে, আর যজমানির দায়িত্ব দিলেন ভ্রাতা গদাধরকে। বিদায়-আদায়ের সুবিধার জন্যে রামকুমার ছাতুবাবুর দলভুক্ত হয়েছিলেন।

সেই সময় কলকাতার সমাজ জীবনে খুব দলাদলি ছিল। বড়লোকদের অঢেল পয়সা, অলস জীবন। করার কিছু নেই,ত দলাদলি কর। সিমুলিয়া ও তার সন্নিহিত এলাকার লোকেরা ছিলেন ছাতুবাবুর দলভুক্ত, আর বাগবাজার এলাকার লোকেরা ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবের দলে। একদিন সভা করে এই দুই এলাকার কুলীন ও মাননীয় মানুষরা রাজা রাধাকান্ত ও ছাতুবাবুকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করে গোষ্ঠীপতির স্বীকৃতি দিলেন। উত্তর কলকাতার দুই মাথা—রাজা রাধাকান্ত দেব আর ছাতুবাবু। রামদুলাল সরকার ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ। ভিখারি থেকে কোটিপতি। দাতা, দরিদ্রবান্ধব। তাঁর দুই ছেলে। আশুতোষ ও প্রমথনাথ। ডাকনাম, সাতুবাবু ও লাটুবাবু। সাতুবাবু থেকে ছাতুবাবু। ঝামাপুকুর ছাতুবাবুর এলাকা। রামকুমার তাঁর দলভুক্ত হয়েছিলেন।

দৈব যদি মানতে হয়, তাহলে বলতে হয় রামকুমার এবং রানী রাসমণির যোগাযোগ। রাসমণি নৌবহর নিয়ে যাবেন কাশী। প্রত্যাদেশ হল, 'রানী! কাশী নয় কালী'। সেই কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও অন্নভোগ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে ঝামাপুকুর টোলের সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ রামকুমার হলেন পূজারী।

এই যোগযোগ না হলে কি হত! ঝামাপুকুর টোল তিন-চার বছরেও তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। যে আশায় রামকুমার কলকাতায় এসেছিলেন সে-আশা পূর্ণ হল না। পরিশ্রমই সার হল আয়ের মুখ দেখলেন না। তারপর হঠাৎ এই পরিবর্তন। জানবাজারে রামকুমারের প্রতিষ্ঠা। রামকুমারের সমাধান না এলে মাকে প্যাকিং বাক্স থেকে বের করা যেত কি? বহুমূল্য মন্দির, ষাট বিঘা জমির উপর উদ্যান, পোস্তা, রুপোর সিংহাসন, দ্বাদশ শিবমন্দির, চাঁদনি, পঞ্চবটী, সবই হয়ে যেতব্যর্থ প্রয়াস। ব্রাহ্মণদের বিচিত্র বিধান। মা কালীকে অন্নভোগ দেওয়ার অধিকার মাহিষ্যের নেই। উচ্চবর্ণের মানুষ তোমার মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করবে না। মা কালীরও জাত আছে। মাহিষ্যরা কিন্তু ক্ষত্রিয়। রাজা হরিশচন্দ্রের উত্তর পুরুষ।

এই যোগাযোগ না হলে কালী কোনো কালেই আমাদের মা হতেন না। শ্মশান কালী, ডাকাত কালীই হয়ে থাকতেন। চারপাশে মনুষ্যরূপী ভূত-প্রেতের নৃত্য। শ্যামা কালী, দক্ষিণা কালী হয়ে আমাদের ঘরে ঘরে করুণা বিতরণ করতেন না। রহস্যময়ীর রহস্য উন্মোচন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া সকলেই ছিলেন মহাসাধক। মা কালীকে মাতৃজ্ঞানে

উপাসনা করেছেন। সিদ্ধিলাভ করেছেন, বিভোর হয়েছেন, পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলার কারণ? তাঁর নিজের সংজ্ঞা! এমনটি কারো ক্ষমতা ছিল কি? অবতার হল বাহাদুরী কাঠ। নিজে ভাসে, তার ওপর চড়ে দশজন ভাসতে ভাসতে সাগর পেরোতে পারে। শক্তির সঙ্গে ভক্তিকে এমনভাবে কেউ মেলাতে পাবেননি। ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তির মিলন। নিরাকার-সাকার দ্বন্দ্বের চির অবসান। সেই কারণেই কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রহ্মগণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বার বার শুনতে চাইতেন মা কালীর ব্যাখ্যা। টয়েনবি, ঐতিহাসিক। তিনি বললেন, ইতিপূর্বে কেউ কখনো কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা অতিক্রম করতে পারেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা থেকে প্রকাশিত হল, নবযুগ ধর্ম।

কেমন ছিল কলকাতার ঘরোয়া কালীপূজা, সে-কালের কলকাতায? কালীশঙ্কব ঘোষের বাড়িতে যাওয়া যাক। ঠিকানা সুবা বাজার বা শোভাবাজার। কালী পূজা হয়, পূজার রাতে। ঘোর তান্ত্রিক। ভীষণ তান্ত্রিক। এঁদের আহ্নিক মানেই আকণ্ঠ সুরাপান। শ্যামাপূজার রাতে গুরু, পুরোহিত, কর্তা, অন্দরের গৃহিনী, সমস্ত মহিলা এমন কি দাসদাসীদের ও সুবাপান করতে হত। কড়া নিয়ম। সকাল থেকেই মদ্যপান। কালী পূজা যে।

ঢুলিরা সকাল থেকেই ঢাক পিটে পাড়া অস্থির করে তুলছে। দুপুরবেলা অন্দরমহলে গিযে গৃহিণীকে বলছে, 'মা, হাতে হাতে একটু তেল দিন আমরা নাইতে যাব, আর জলপান।' গৃহিনী মদে চুব। রেগে গিয়ে বলছেন, 'কি! তোরা আমার বাড়িতে তেল, জলপান চাচ্ছিস? মেঠাই খা, মোমবাতি মাখ।'

পূজার দালানে সাত হাত লম্বা প্রতিমা। পর্বতপ্রমাণ মিষ্টান্নের স্তূপ। একের পর বলি হয়েই চলেছে। কান ফাটানো ঢাকের আওয়াজ। পশুদের আর্ত চিৎকার। অসুরেব মতো কয়েকটা লোক্ খাঁড়া হাতে নাচছে। পশুর রক্তে বাড়ির প্রাঙ্গণ ডুবে যেত। থই থই করত চারপাশ। নর্দমায় রক্তের স্রোত বইত। একবার কালী পূজার রাতে কর্তার খেয়াল হল, আমি এত পশুকে বলিদান দিয়ে স্বর্গে পাঠাচ্ছি, আমার কত পুণ্য হচ্ছে, আচ্ছা স্বয়ং গুরুদেবকে যদি বলি দিয়ে স্বর্গে পাঠাই, তা হলে ত আরো পুণ্য হবে। গুরুদেব মদে চুর হয়ে আছেন। তাঁকে বলামাত্রই নেচে উঠলেন, 'চলো, চলো, আর দেরি নয়, রাত থাকতে থাকতেই স্বর্গে চলে যাই। মা, আসছি গো!'

গুরুদেবকে হাড়িকাঠের কাছে আনা হল। কর্তা বললেন, 'গুরুদেব গলা লাগান। জয় মা, বলে হয়ে যাক।' যাঁরা বলিদান করছিলেন, তাঁরা সবাই কর্মকার। কর্তার আদেশে সকলকেই মদ্যপান কবতে হয়েছে, তবে মাত্রা কম। এত বলি দিতে হবে মাতাল হলেই সর্বনাশ। তাঁরা ভাব দেখাচ্ছেন, কতই না খেয়েছি? তা না হলে কর্তা আবার জোর করে গিলিয়ে দেবেন। বলিদানের দলপতির মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি বললেন, 'কর্তামশাই! এখানে যত খাঁড়া আছে, সব খাঁড়া চিরকাল পশুবলি দিয়ে আসছে, এতে

কি গুরুদেবকে বলি দেওয়া যায়? গুরুদেবের জন্যে চাই নতুন খাঁড়া। আপনি ভাববেন না। একটু অপেক্ষা করুন। বাড়িতে নতুন খাঁড়া তৈরি আছে। নিয়ে আসছি। এই যাব আর আসব।'

দলপতি দলেব সকলকে সতর্ক থাকতে বলে চলে গেলেন থানায়। পুলিস এসে গুরুদেবেব স্বর্গযাত্রা বন্ধ করলে। তন্ত্রে বলিদানের নির্দেশ আছে। কালিকাপুরাণ বলছেন, 'চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা।' সাধক মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃতদ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্যদ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবে। শাস্ত্রে আট রকমের 'বলি'-র কথা বলা হয়েছে। পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার, শশ, সিংহ, মৎস্য, স্বগাত্র-রুধির, ঘোড়া, হস্তী। এর পরে আছে মহাবলি। মহাবলি হল শরভ। বিশেষ এক ধরনের বৃহৎ মৃগ, উটও হতে পারে। আর অতি বলি হল, মানুষ।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'মহাশয়, আমাব একটি জিজ্ঞাস্য আছে; বলিদান করা কি ভাল? এতে তো জীবহিংসা করা হয়।'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রে আছে, বলি দেওয়া যেতে পারে।

'বিধিবাদীয়' বলিতে দোষ নাই। যেমন অষ্টমীতে একটি পাঁঠা।' এরপরে নিজের অবস্থাব কথা বলছেন, 'আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বলি দেখতে পারি না। মাব প্রসাদী মাংস এ-অবস্থায় খেতে পারি না। তাই আঙুলে করে একটু ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটি; পাছে মা রাগ করেন।'

সংশয়েব উত্তব পুরাণও দিচ্ছেন, 'ব্রহ্মা, স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এই জন্যে যজ্ঞে পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলছেন, 'বিধিবাদীয়'। একটি ভয়ের কথা বলছেন, প্রসাদী মাংস খেতে পারেন না, তাই আঙুলে করে ছুঁয়ে মাথায় ফোঁটা কাটেন, পাছে মা রাগ করেন। পাথরের মা রাগ করতে পারেন?

অতীত ঘুরে আসি। মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হল মায়ের মন্দির। রামকুমার হলেন প্রথম পূজারী। কয়েক মাসের মধ্যেই মথুরবাবু ধরে ফেললেন তরুণ গদাধরকে। সদাই ভাবে বিভোর। কারো ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসতে চায় না। শুধু দেখে, বাগান, ফুল, গঙ্গা মন্দির। মথুরবাবু বললেন, তুমি হবে মায়ের বেশকার। তুমি শিল্পী, কবি ভাবুক। এইটুকুই চেনা গেছে, ধরা গেছে। রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন মায়েব মন্দিরের পূজারী। আর রামকুমার নিলেন রাধাগোবিন্দের অপেক্ষাকৃত সহজ পূজার ভার। গদাধর দাদাব কাছে কালীপূজা শিখেছিলেন। 'রামকুমার তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রী কালিকামাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঐরূপে দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের যাহা শিক্ষা করা কর্তব্য তাহা অচিরে শিখিয়া লইলেন।' শাক্তী দীক্ষা না নিলে দেবীপূজার অধিকারী হওয়া যায় না। প্রবীণ শক্তিসাধক কেনারাম

ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে শক্তিমন্ত্রে যথাবিহিত দীক্ষা দিলেন। সাধক ভট্টাচার্য মহাশয় কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে থাকতেন। মথুরবাবু ও রামকুমারের পরিচিত। কালীবাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। সম্মানিত ব্যক্তি। কানে বীজমন্ত্র পড়া মাত্রই গদাধর সমাহিত। গুরু সেই দিনই এই বুঝে গেলেন, তাঁর শিষ্য সাধারণ মানুষ নয়।

গদাধর মায়ের পুজারী হলেন। বিধিসম্মত পূজার আড়াল থেকে প্রকাশিত হতে থাকল অলৌকিক পূজা। চাল-কলা-বাঁধা পুরোহিতবা সে-পূজার মর্ম বুঝবেন না। সে- পূজা বিধি মানে না। ভাবের পথে চলে। পাষাণ প্রতিমা জীবন্ত হয়। বেদি থেকে নেমে এসে সাধকের সঙ্গে খেলা করেন। কথা বলেন। আব্দার করেন। গদাধর মায়ের নাকের কাছে তুলো ধরে দেখছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। মথুরবাবু, রানী রাসমণি বুঝে গেলেন, মায়ের কৃপায় মন্দিরে এক মহাসাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। তন্ত্র-মন্ত্রেব অক্ষরমালা ছেড়ে মা বেরিয়ে আসবেন। কালী, ভয়ঙ্করী, রহস্যময়ী—এই ভয়, এই ভীতি ভেঙে যাবে। অনন্তের বিস্তৃত অঙ্গনে জীবকে মায়াপাশে বেঁধে জীবন-মৃত্যুব খেলা খেলছেন অনন্ত-রূপিণী কালী। গদাধর গান গাইছেন—'কে জানে মা কালী কেমন/ষড়দর্শনে না পায় দরশন/' গদাধর গাইছেন 'মা ত্বং হি তাবা' কুড়ি থেকে পঞ্চাশ—তিরিশ বছরের একটি জীবন বেরিয়ে এল, যার মধ্যে গোটানো রইল 'তিন কাল'। সর্বকালের 'শব-সাধনা' নয় 'সব-সাধনা'র একটি 'কমপ্যাক্ট-ডিস্ক' তৈরি হল পঞ্চবটীতে এই সাধকের সাধনায়।

মথুরবাবু বললেন—বাবা, আমি যে তোমাকে চিনেছি—তুমিই শিব, তুমিই কালী, আমি তোমার সেবক। বৈধী পূজা তোমাকে আর করতে হবে না। কালীপুজো নয়, কালী-সাধো। তোমার সাধনায় লেগে থাকুক আমাদের ছিন্ন চিহ্ন। তুমি স্টিমার আমরা 'গাধা বোট'। মায়ের মন্দিরে পূজারী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই রামতারক। তাঁর আর এক নাম হলধারী। সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান সাধক। বিষ্ণুর উপাসক হলেও শক্তিপূজার বিরোধী ছিলেন না। তবে পশুবলির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। একটা নিয়ম ছিল, এই এই দিন মন্দিরে বলি হবে। সেই সব দিনে অতি ক্ষুণ্ণ মনে তিনি মায়ের পূজা করতেন। এইভাবে একটা মাস গেল। তারপর হলধারী একদিন সন্ধ্যা করতে বসেছেন। হঠাৎ দেখছেন, মা ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন—আমার পূজা তোকে করতে হবে না, করলে সেবাপরাধে তোর ছেলের মৃত্যু হবে। হলধারী ভাবলেন, এ তাঁর মাথায় খেয়াল। এই দর্শন, এই সাবধানবাণীকে তিনি পাত্তা দিলেন না। পুজো যেমন করছিলেন. সেই রকমই করতে লাগলেন। হঠাৎ দেশ থেকে এল পুত্রের মৃত্যুসংবাদ। তিনি মায়ের পুজো ছেড়ে শ্রীশ্রী রাধাকান্তের পুজোয় চলে এলেন। বলতে লাগলেন, কালী তামসী, তমোগুণময়ী। শ্রীরামকৃষ্ণকেও সে-কথা বললেন। ঠাকুর খুব দুঃখ পেলেন। ছুটলেন কালীঘরে মায়ের কাছে। মা কালী তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন, খেলা করতেন, মান অভিমান করতেন, আদর আব্দার করতেন,

শয়ন দেওয়ার সময় বলতেন, 'তুই আমার পাশে শো'।

ঠাকুর মাকে বলছেন, দু-চোখ জলে ভরা, 'মা হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সে তোকে তমোগুণাময়ী বলে, তুই কি সত্যিই তাই?' মা হাসলেন, বুঝিয়ে দিলেন তাঁর স্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটছেন, কোথায় সেই হলধারী! ওই যে বসে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাঁধে চেপে বসলেন, 'তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী। হলধারী বিষ্ণুঘরে পূজার আসনে বসেছিলেন, তিনি দেখছেন গদাধর নয়, স্বয়ং মা কালী কাঁধে চেপেছেন। তিনি ভাবে বিভোর হয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

১৮৮৪ সাল, ১৮ অক্টোবর, শনিবার। আজ কালীপূজা। রাত আটটা। মাস্টারমশাই মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করছেন। উদ্যানমধ্যে মাঝে মাঝে দীপ—দেবমন্দির আলোকে সুশোভিত। মাঝে মাঝে রোশনচৌকি বাজিতেছে। কর্মচারীরা দ্রুতপদে মন্দিরের এই স্থান হইতে ওই স্থানে যাতায়াত করিতেছেন। গ্রাম হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা বহু সংখ্যক লোক ঠাকুর দর্শন করিতে সর্বদা আসিতেছে।

বিকেলে নাটমন্দিরের চণ্ডীর গান হল—রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর। ছোট খাটটিতে বেশ গুছিয়ে বসে আছেন। নহবতে মা রয়েছেন। আলোর মালায় ঘেরা। মানুষের স্রোত বইছে। ঠাকুরের সামনে মেঝেতে বসে আছেন ভক্তমণ্ডলী। সারাটা বিকেল চণ্ডীর গান শুনছেন, সেই গানের রেশ মাথায় ঘুরছে। আস্তে আস্তে গাইছেন,

কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥

একটু একটু করে আরো গান, আরো আরো গান। দেবালয়ে ব্যস্ত পূজার আয়োজন। মধ্য রাত এগিয়ে আসছে, এদিকে ঠাকুরের ভাব জমছে। প্রেমানন্দে নাচছেন আর গাইছেন কমলাকান্তের গান, মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে।

রাত এগারোটা। মহানিশা। মিশকালো আকাশ। কালোর দাপটে তারারাও ক্ষীণ-প্রভ। জোয়ার এসেছে গঙ্গা তত্তরিয়ে ছুটছে উত্তরমুখো। নিঃশব্দ আলোয় উদ্যান, গঙ্গার ধার, মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাঁ ঝাঁ করছে। এত আলো, এত মানুষ, তবু কেমন যেন সব থমথমে। তীরের আলো তরতরে গঙ্গায় পড়ে চপলা হয়েছে।

আর কয়েক মিনিট পরেই বারোটা বাজবে। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল পূজারীর সাজে ঘরে এলেন। আজকের পূজারী তিনি। স্মৃতি ভিড় করে আসছে। মথুর নেই। মথুরের সময় আরো বোলবোলা ছিল। আরো আলো, যাত্রা, গান। বড় বড় লুচি, কচুরি, দই, মিষ্টি, পায়েস।

সেবার মনে আছে। মথুর বনহুগলীর এক ব্রাহ্মণকে তন্ত্রসাধক হওয়ার জন্যে বলেছিলেন। তিনি এলেন রাত এগারোটায়। মথুর রেগে গিয়ে বললে, কটার সময়

সময় আসার কথা ছিল! ব্রাহ্মণ বললেন, আমি তিনটে কালীপুজো সেরে এলুম তো, তাই একটু দেবি হয়ে গেল।

মথুর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, বাবা! শুনছ, এ মাকে বলে কি-না তিনটে, টে , মা আমার টে?

তাকে পূজো করতে দিলে না। পাওনা দিয়ে বিদায় করে দিলে। সেবার তন্ত্রসাধক হল হৃদয়।

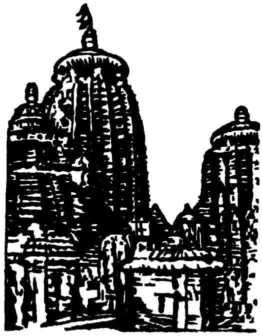
বামলাল ভূমিষ্ঠ হযে ঠাকুরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন—তবে আমি আসি।

ঠাকুর বললেন, ওঁ কালী, ওঁ কালী। সাবধানে পূজো কোরো, সাবধানে, খুব সাবধানে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে ঠাকুরের এইবার বিদায় নেবার পালা। শেষ পূজা। রামলাল পূজারী, ঠাকুর দর্শক। ওই আসন, ঘণ্টা, কোষা-কুষি পঞ্চপ্রদীপ, চামর, কত নেড়েছি, ঘুরিয়েছি! এইবার বলি। সুস্নাতে, মাল্যভূষিত ছাগশিশু হাড়কাঠের সামনে মৃদু মৃদু ডাক ছাড়ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরে চলেছেন নিজের ঘরে। বলির দৃশ্য সহ্য করতে পারেন না।

১৮৮৫, ৬ নভেম্বর, শুক্রবার। স্থান শ্যামপুকুর বাটী। সব আয়োজন সমাপ্ত। ভক্তগণ বিমূঢ়। পট কোথায়? ঘট কোথায়? প্রতিমা কোথা? আসনে উপবিষ্ট পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ। নিজেকেই নিজে পূজা করছেন।

পূজ্য পূজক এক হল
কালীর ছেলে কালী হল
কালকে পরাস্ত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।।



কৃপা কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্যামপুকুর বাটীতে সকাল। কলকাতার শীতের সকাল যেমন হয়। ঘিঞ্জি এলাকা। গায়ে গায়ে বাড়ি। খোলা উনুনের ধোঁয়া ভারী বাতাসের সঙ্গে জড়িয়ে আচ্ছাদনীর মতো ঝুলে আছে। ম্যাটম্যাটে রোদ। পল্লীর জেগে ওঠার মিলিত মিশ্রিত যাবতীয় শব্দ। বারান্দায় কাকের কর্কশ চিৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উঠে বসেছেন। কণ্ঠক্ষতের চিকিৎসার জন্যে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামপুকুর বাটীতে এসে উঠেছেন। বাড়ির মালিক গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য। ঠিকানা ঃ ৫৫, শ্যামপুকুর স্ট্রিট। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তরাই বাড়িটি ঠিক করেছেন। শ্যামপুকুর স্ট্রিট শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত। এই রাস্তায় তাঁর অনেক ভক্ত থাকেন। নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ঠাকুর যাঁকে কাপ্তেন বলে সম্বোধন করেন। প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের মোটা বামুন। কালীপদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ, ঠাকুরের বিশেষ কৃপাধন্য। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে 'দানা' বলে ডাকেন, সেইজন্যে রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে তিনি 'দানাকালী'। সুগায়ক, বেহালা এবং বংশীবাদক। এঁর বাঁশী শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এই ভাঙাবাড়ির দেখা-শোনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার, সাজানো গোছানোর যাবতীয় দায়িত্ব দানাকালীর। অদূরেই তাঁর বাড়ি, ২০, শ্যামপুকুর লেন। এই সব ভক্তদের বাড়িতে ঠাকুর একাধিবার এসেছেন।

ঠাকুর তাকিয়ে আছেন দেয়ালে টাঙানো নানা ছবির মধ্যে বিশেষ একটি ছবির দিকে—যশোদা ও বালগোপাল। পাশেই আর একটি ছবি—মনোরম সংকীর্তনের দৃশ্য। যেদিন বলরামবাবুর বাড়ি ছেড়ে সন্ধ্যার সময় এই বাড়িতে এলেন, শুক্রবার, ২ অক্টোবর ১৮৮৫, সেদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত লণ্ঠন তুলে তুলে ছবি দেখাচ্ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন বাদুড়বাগানের নবগোপাল ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, 'ছবিতে আপনি আপনাকেই দেখছেন।' নবগোপাল ঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেছিলেন। ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর। বাদুড়বাগানের স্মৃতি ভেসে আসছে। নবগোপালের বাড়ির উঠনে সে কী নৃত্যগীত। ঠাকুর তাকিয়ে আছেন, ভাবছেন, কোথায় দক্ষিণেশ্বর আর

কোথায় উদ্যানবাটীর পরিবর্ত এই শ্যামপুকুর বাটী। শীত, শীত, ভিজে, ভিজে বদ্ধ একটা পরিবেশ। ভাবছেন, সারদার জীবনে মা সাংসারিক শান্তি আর দিলেন না! এই তো ছাতে ওঠার সিঁড়ি, ছাতের দরজার পাশে চার হাত মতো আচ্ছাদিত চাতাল, সেইখানে ভোর তিনটে থেকে রাত এগারোটা। রাত দুটোয় উঠে স্নান, শৌচ সারে; কারণ একটি মাত্র শৌচালয়। ভক্ত সেবক অনেক। ঠাকুর সকালে আহার করেন, ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ। সন্ধ্যায় দুধ আর যবের মণ্ড। সবই তরল। মা সারাদিন ওই জায়গাটিতে বসে এই সব পথ্য তৈরি করেন। অবসরে ধ্যান-জপ। সাহায্য করেন ভক্তিমতী সেবিকা গোলাপ-মা। দোতলার পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট একটি ঘর মায়ের জন্যে নির্দিষ্ট আছে। সেই ঘরে আসতে আসতে রাত এগারোটা। এত ভক্তের আসা-যাওয়া, ডাক্তার-বদ্যি। কেউ জানেন না—মা কোথায়! তিনি অন্তরীক্ষে।

বেলা বাড়ল। গলার ক্ষতও বাড়ছে। মাঝে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে কিছু ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতার বিশিষ্ট কবিরাজবৃন্দ, গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল আগেই রোগপরীক্ষা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কবিরাজীশাস্ত্রে এই ব্যাধির নাম রোহিণী, অর্থাৎ ক্যানসার। দুশ্চিকিৎস্য। এখন দেখছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি ঠাকুরের নাড়ি পরীক্ষা করছেন। হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বাড়ল কেন? কাল আবার রক্ত পড়েছে? তাহলে ক্ষত ক্রমশই বাড়ছে। ওষুধটা ধরেও ধরল না! মনে হয় খাওয়ার কোনো অনিয়ম হয়েছে। ঝোল খাও?'

ঠাকুর বললেন, 'ওই, যতটুকু গলা দিয়ে নামে।'

'আচ্ছা বল তো, ঝোলে কি কি আনাজ পড়ছে?'

'ওই তো, আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দু এক টুকরো ফুলকপি!'

ডাক্তার সরকার আঁতকে উঠলেন, 'অ্যাঁ—ফুলকপি খেয়েছ? ঠিক ধরেছি, খাওয়ার অত্যাচার! ফুলকপি বিষম গরম, দুষ্পাচ্য! ক টুকরো খেয়েছ?'

ঠাকুর অপরাধী বালকের মতো মুখ করে বললেন, 'একটুকরোও তো খাইনি, তবে ঝোলে ছিল।'

ডাক্তার বললেন, 'খাও আর নাই খাও, ঝোলে ওর সত্ত্ব তো ছিল—সেই জন্যেই তোমার হজমের ব্যাঘাত হল, ব্যারামটা হঠাৎ বেড়ে গেল।'

ঠাকুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কি গো! কপি খেলুম না, পেটের অসুখও হল না, ঝোলে সামান্য একটু কপির রসের জন্যে ব্যারাম বেড়ে গেল! অবাক কথা। মানতে পারছি না।'

ডাক্তার বললেন, 'ওই একটুতেই যে কত অপকার করতে পারে, তোমার ধারণা নেই। আমার জীবনের একটা ঘটনা তাহলে শোনো। শুনলে বুঝতে পারবে। আমার হজমশক্তিটা বরাবরই কম; মাঝে মাঝেই অজীর্ণে খুব ভুগতে হত; সেইজন্যে খাদ্য সম্পর্কে আমি খুব সতর্ক। একটা নিয়ম মেনে চলি। দোকানের কোন জিনিস খাই

না। ঘি, তেল পর্যন্ত বাড়িতে করিয়ে নি। তবু একবার খুব সর্দি থেকে ব্রন্‌কাইটিস হয়ে গেল, কিছুতেই সারতে চায় না। তখন মনে হল, নিশ্চিত খাবারে কোনো দোষ হচ্ছে। সন্ধান করে কোনো দোষই খুঁজে পেলুম না। তারপর হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, যে গরুটার দুধ খাই, সেই গরুটাকে কাজের লোক কতগুলো মাষকড়াই খাওয়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলুম, কোথা থেকে কয়েক মন ওই কড়াই পাওয়া গিয়েছিল, সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চায় না বলে কিছুদিন ধরে গরুকে খাওয়ানো হচ্ছে। তখন দিন হিসেব করে পেলুম, যবে থেকে গরু মাষকড়াই খাচ্ছে, প্রায় সেই সময় থেকেই আমাকে সর্দিতে ধরেছে। বন্ধ কর, বন্ধ কর। কড়াই খাওয়ানো বন্ধ করার কয়েকদিন পরেই আমার সর্দি কমতে লাগল। অনেক দিন ভুগলুম। বায়ু পরিবর্তনে হাজার পাঁচেক গেল। কি থেকে কি হয় বুঝলে তো!'

ঠাকুর খুব আনন্দ পেয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ও বাবা, এ যে দেখছি ওই তেঁতুলতলা দিয়ে গিয়েছিল বলে অম্বল হল, প্রায় সেইরকম।'

ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই হাসছেন। বোঝার উপায় নেই অসুখ না উৎসব। ওই যেমন বলে দিয়েছেন, রোগ জানুক আর দেহ জানুক। থাক শালার দেহ একা পড়ে। মন তুই পালিয়ে আয় ভ্রমরের মতো মজে থাক শ্যামাপদ নীলকমলে। যেমন বলেছিলেন, 'থাক শালার 'আমি' দাস 'আমি' হয়ে।

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, 'শুধু ওষুধ নয়, ওষুধ, পথ্য, পরিবেশ-ট্রিনিটি। পরিবেশ পালটাতে হবে। এখানে চিকিৎসা হবে না। খোলামেলা, আলো ঝলমলে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ চাই। দক্ষিণেশ্বরে যাঁর এত বছর কেটেছে, তাঁর পক্ষে এই জায়গা আরোগ্যের প্রতিকূল। হবে না। দিস প্লেস ইজ আনসুটেবল! একটা বাগান বাড়ির চেষ্টা করো!' কথা শেষ করে ঠাকুরের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'বেশ আছ পরমহংস! রোগ জানুক আর দেহ জানুক! এদিকে ভেবে ভেবে আমাদের রাতের ঘুম চলে গেল। শোনো, তুমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ। শরীরে রক্ত কমে গেছে। খাবো না বললে হবে না, তোমাকে কচি পাঁঠার সুরুয়া খেতে হবে। আমি এখন যাচ্ছি, আবার আসব' তোমার প্রেমে পড়ে গেছি পরমহংস। মহেন্দ্র সরকারের এই রকম কখনো হয়নি!'

সুপুরুষ সায়েবি মেজাজের কট্টর যুক্তিবাদী ডাক্তার সরকার চলে গেলেন। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তরল পথ্য একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। গিলতে পারছেন না। অতি কষ্টে একটু! কপালে ঘাম ফুটে গেছে। ডাক্তার একদৃষ্টে দেখছিলেন! তাঁর মতো কঠিন মানুষের মুখেও বেদনার ছায়া। তিনি চলে যাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ডাক্তার খুব লোক।'

ঠাকুর বললেন, 'খু-উব'!

গৃহী ভক্ত, মুরুব্বি মানুষ, রামচন্দ্র দত্ত মশাই এতক্ষণ দূরে বসেছিলেন, কাছে

এসে বললেন, 'ডাক্তার সরকার তো বলে গেলেন, এবার তাহলে আপনার জন্যে কলকাতার বাইরে একটা বাগানবাড়ি দেখি?'

ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, এখানে হজম খিদে কিচ্ছু হচ্ছে না।'

রামবাবু মনে মনে ভাবছেন, শুধু বাড়ি নয়, বাগানবাড়ি। এমন বাড়ি কোথায় মিলবে। বাগানবাড়ির মালিকরা অবশ্যই বড়লোক। শখের বাগানবাড়ি কোন দুঃখে ভাড়া দিতে যাবে। রাম দত্ত মশাই হাত জোড় করে ঠাকুরকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ্ঞে, বাড়ি কোন অঞ্চলে অনুসন্ধান করব?

ঠাকুর ঈষৎ হেসে বললেন, 'আমি কি জানি? সে তো তোমরাই জানবে!'

রামবাবু মনে মনে বললেন, প্রভু! আমাদের সঙ্গে এখনও আপনার এইভাব! বলে দিন কোন্ দিকে যাব। সব জানেন আপনি। অনর্থক ঘুরিয়ে মারবেন না। প্রকাশ্যে যা বললেন, 'কাশীপুর, কি বরাহনগর অঞ্চলে চেষ্টা করব?'

ঠাকুর ইঙ্গিতে জানালেন, করো।

অঘ্রাণ শেষ হতে চলল, যা করার এই মাসেই করতে হবে। পৌষে ঠাকুর বাড়ি বদলাতে চাইবেন না। ঠাকুরের আর এক পরমভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী। ছোট-খাটো জমিদার। কাশীপুরে তাঁর বাড়ি। বেদান্তবাদী। বড় মজার মানুষ। নিজেকে অতিরিক্ত জাহির করার দোষে হাস্যাস্পদ হতেন পদে পদে। ছেলের নাম রেখেছেন মৃগাঙ্ক-মৌলি পুততুণ্ডী। বাড়িতে একটা হরিণ আছে, তার নাম কপিঞ্জল। তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম, আগমাচার্য ডমরুবল্লভ। তিনি একতারা বাজিয়ে প্রণবোচ্চারণ, ওঁ, ওঁ করেন, মাঝে মাঝে হুঙ্কারধ্বনি। কুলকুণ্ডলিনী জাগছে। বাড়িতে প্রতিষ্ঠিতা দেবী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা। 'জগদ্ধাত্রী পূজাও হত। তিনি একটি ঘোড়ায়টানা গাড়িতে, যাকে ইংলণ্ডে বলে 'বগি' চেপে যাতায়াত করতেন। সেই সময় অনবরত চিৎকার করতেন, 'তারা তত্ত্বমসি, ত্বমসি তৎ'। তাঁর একটি বাঘছাল ছিল। সেইটি পথপ্রান্তে বিছিয়ে গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে, হাতে একতারা নিয়ে সাড়ম্বরে সাধনায় বসতেন। সুন্দর কান্তি, বিশাল বপু, চোখে না পড়ে উপায় নেই। সাধন শেষে ব্যাঘ্রাজিনটি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে চলে যেতেন। ঠাকুর তাঁকে এক আঁচড়েই চিনে ফেলেছিলেন। কারণ 'ওই বাঘের ছালটা কার' একদিন ঠাকুরের এক অন্তরঙ্গ ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন 'ওটা মহিম চক্রবর্তীর। রেখে গেছে, কেন জান? লোকে দেখে জিজ্ঞেস করবে 'ওটা কার' তখন আমি তার নাম করলে ধারণা হবে মহিম চক্রবর্তী এক মস্ত সাধক।' রাম দত্ত মশাই এই মহিমবাবুর যোগাযোগ কাশীপুরের মতিঝিলের উত্তরে কাশীপুর রোডের ওপর রানী কাত্যায়নীর জামাই গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগানবাড়িটি ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় পেয়ে গেলেন। এগার বিঘা চারকাঠার কিছু বেশি জমির ওপর এই উদ্যানবাটী। দুটি পুকুর। উত্তর-পূর্ব ধারেরটি বিশাল। স্বচ্ছ টলটলে জল। প্রশস্ত শান বাঁধানো ঘাট। পশ্চিমেরটি একটু ছোট। দুটি

পুকুরের মাঝে প্রায় গোলাকার ইট বাঁধান পথ। অতিসুন্দর উদ্যান ঘেরা দোতলা একটি বাড়ি। নিচে চারখানি, ওপরে দুখানি ঘর। দোতলায় রেলিংঘেরা স্বল্প পরিসর সুন্দর একটি ছাত। দোতলায় ওঠার ঝকঝকে কাঠের সিঁড়ি।

প্রথমে ঠাকুর আঁতকে উঠেছিলেন, 'বলো কি? মাসে আশি টাকা! আমার জন্যে আশি টাকার বাড়িতে কাজ নেই বাপু! যা থাকে বরাতে, দক্ষিণেশ্বরেই বরং ফিরে যাই!' শ্যামপুকুবে অবস্থানের আজ শেষ দিন। ১০ ডিসেম্বব, ১৮৮৫। শ্রীশ্রীঠাকুবের শ্যামপুকুর-লীলার এই শেষ সন্ধ্যা। ঘরে ঠাকুরের প্রবীণ ভক্তদের অনেকেই ছিলেন। তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, টাকাব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। ঠাকুর বললেন, 'একটি শর্তে আমি যেতে পারি যদি ওই আশি টাকা ভাডার পূর্ণ দায়িত্ব সুরেন্দ্র নেয়।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ডস্ট কোম্পানিব মুৎসুদ্দি। সিমুলিয়ায় বাড়ি। ধনী মানুষ। ঠাকুরের পরমভক্ত। তিনিই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি 'গুরু' রূপে বরণ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে রাজি। তিনি অঙ্গীকার পত্র সই করে দিলেন। আপাতত ছমাসের জন্যে বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হল। সুরেন্দ্রনাথকে কাছে ডেকে ঠাকুর ফিসফিস করে বললেন, 'দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানী-মেরানী ছাপোষা লোক, এরা এতটাকা চাঁদা তুলতে পারবে কেন, এ বেশ ভাল হল। তুমি দাযিত্ব নিলে। দেখ সুরেন্দর থাকাই বলো আর খাওয়াই বলো চাঁদা করে হচ্ছে শুনলে আমি আঁতকে উঠি। কখনো তেমন ব্যবস্থায় মা আমাকে ফেলেননি। তবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে মথুর চলে যাওয়ার পর অনেকটা চাঁদার মতোই হল বটে। জমিদারি নানা শরিকে টুকরো হল। মন্দিরে মায়ের সেবার পালা পড়তে লাগল। কিন্তু ওই চাঁদা ব্যবস্থায় আমি ঠিক ঠিক পড়িনি। রাসমণির বন্দোবস্তে আমার জন্যে মাসকাবারি সাতটাকা বন্দোবস্ত আছে, আর যতদিন থাকব মায়ের মন্দিরের প্রসাদ আমাকে দেওয়া হবে। এটাকে তুমি পেন্সান বলতে পার। তাই শ্যামপুকুরে আসার সময় বলরামকে ডেকে বলেছিলুম, তুমি আমার খাবার খরচা দেবে। চাঁদায় আমি খেতে পারব না।'

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'ও-সব আপনি একদম ভাববেন না। ভাবনা আমাদের। আপনার কাজ তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠা।'

গিরিশচন্দ্র এক পাশে নীরবে বসেছিলেন। তিনি সহসা বললেন, 'আপনি মাঝে মাঝে কি যে দেখান! আমি কি বুঝতে পারছি না ভাবছেন? আপনি ইচ্ছা করলেই রোগ সেরে যায়-আর আমি ভুলছি না।' ঠাকুর তাকালেন, হাসলেন। গিরিশবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। থিয়েটার আছে।

ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে বললেন, 'বিশ্বাসটা একবার দেখেছো!'

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অদ্ভুত পরিবর্তন। তিনি বসে আছেন। মনে মনে স্তবপাঠ করছেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে ডাক্তারকে দেখিয়ে মৃদুমৃদু

হাসছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরম ভক্ত। উপাধি মজুমদার। গীতিকার। সুন্দর গান রচনা করেন। ঠাকুর এইবার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু ভাল দেখছো?'

ডাক্তার সরকার বললেন, 'বলতে ভয় হয়—এখুনি হয়ত কিছু রোগ দেখাবেন।'

ঠাকুর আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। ভাল থাকলেও একজন জানেন, সময় আসন্ন। তিনি, শ্রীশ্রীমা। তিনতলার চাতালে পথ্য তৈরিতে ব্যস্ত। সমস্ত ইঙ্গিত মিলে যাচ্ছে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'সারদা! যখন দেখবে, আমি যার তার হাতে খাচ্ছি, কলকাতায় রাত্রিবাস করছি, নিজের খাবারের অগ্রভাগ অপরকে দিয়ে খাচ্ছি, আর যখন দেখবে অধিক লোক একে দেবজ্ঞানে মানছে, শ্রদ্ধাভক্তি করছে তখন জানবে এর অন্তর্ধানের সময় হয়ে এসেছে।' সব মিলে যাচ্ছে।

দুই

১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫। শীতের কলকাতা। কদিন পরেই বড়দিন। সায়েব পাড়া, নেটিব ক্রিশ্চান পাড়ায় সাজো সাজো রব। জাঁকালো শীত। কমলালেবুর মতো রোদ। বেলা তিনটে নাগাদ শ্যামপুকুর স্ট্রিট থেকে দুটি ঘোড়ার গাড়ি বেরলো। প্রথমটিতে ভক্ত সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ। দ্বিতীয়টিতে শ্রীশ্রীমা, মায়ের সঙ্গী ও জিনিসপত্র। ঠাকুর একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে নিলেন, ওই বাড়ি, ওই বারান্দা! আর না আর না। সত্তর দিনের স্মৃতি পড়ে রইল ইতিহাসে। গাড়ি চলেছে দুলকি চালে, ঘোড়ার গাড়ির যেমন চলা উচিত। এই পথে ঠাকুর সপার্ষদ কতবার আসা যাওয়া করেছেন এই মাস কয়েক আগে। সুস্থ, সবল। আনন্দে, উল্লাসে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। সারা কলকাতাকে যিনি আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উদ্বেল করতেন, তিনি আজ শরীরে বড়ই দুর্বল। চলতে ফিরতে কাঁপেন। গত তিন-চার মাস শরীর অতি সামান্যই খাদ্য গ্রহণ করতে পেরেছে! দেহ যত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে মুখমণ্ডল তত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর! ঠাকুর এদিকে, ওদিকে তাকিয়ে দেখছেন। এই তো গিরিশের পাড়া! ওই তো বলরামের বাড়ি। ওই তো ওই দিকটায় পশুপতি বোসের বাড়ি। শীতের দুপুর অপরাহ্নে ঠেকেছে। দোকান-পাট রাস্তাঘাট রোদের আকর্ষণে জমজমাট। ওই তো ওই বিবি বাজারের সেই দিশী মদের দোকানটি। একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতা আসার পথে এই দোকানের সামনে কয়েকজন মানুষের মত্ততা দেখে ঠাকুর চলন্ত গাড়িতে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, একটি পা পাদানিতে, উল্লাসে চিৎকার করছেন, 'চালাও, চালাও, চালিয়ে যাও।' যে ভাবেই হোক, যে পথেই হোক দেহাতীত আনন্দে চলে যাও। এই জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর স্বয়ং সচ্চিদানন্দ। বাঁ দিকের রাস্তাটি ঢুকে গেছে গঙ্গার দিকে। ওখানে আছেন, মা চিত্তেশ্বরী, মা সর্বমঙ্গলা। ইতিহাসের পথ ধরে চলেছে আর দুটি ঐতিহাসিক গাড়ি। প্রথমটিতে লীলাময় ভগবান, দ্বিতীয়টিতে লীলাময়ী ভগবতী। মানব লীলায় মেতেছেন। পেছনের

বগিতে মাতৃমূর্তি সারদা। ভবিষ্যৎ তিনি জেনে ফেলেছেন, তাই স্থির, প্রশান্ত অতি।

উদ্যানবাটীর লোহার ফটক পেরিয়ে গাড়ি প্রবেশ করছে। ক্যালেন্ডারে ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫, শুক্রবার। অস্তাচলে সূর্য। পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ আকাশে ওঠার সাজঘরে। প্রবেশমাত্রই ঠাকুর মহানন্দে বললেন, 'বাঃ, বাঃ এই তো বেশ, এই তো বেশ।' ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দে দ্বিতীয় গাড়িটি থামল। ঠাকুরকে সাবধানে উত্তরণ করানো হল; সকলেই সাবধান। সুকোমল দেহের কোথাও যেন ধাতব আঘাত না লাগে। তিনি উত্তীর্ণ হয়ে উদ্যান নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের মতো না হলেও, এ বেশ!' হঠাৎ দুর্বল শরীর ভয়ঙ্কর সবল। এখন দেহ নয়, হাঁটছে মন। তর তর করে এগোচ্ছেন। পেছনে লোহার গেট ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে লৌহময় শব্দে। অস্তাচলে সূর্য। বন্ধ হয়ে রইল আটটি মাসের গাঢ় গূঢ় ভবিষ্যৎ, যুগান্তকারী উপাদানের সাজঘব! বসে গেল একটি অদৃশ্য সুউচ্চ 'ট্র্যান্সমিশান টাওয়ার', 'শ্রীরামকৃষ্ণ মহাভাব তরঙ্গের', যা পরবর্তীকালে হবে বেলুড়মঠের চূড়া।

সবাই এগোচ্ছেন উদ্যানমধ্যস্থ বাড়িটির দিকে। নিচে চারখানি ঘর। মাঝের ঘরটিকে হলঘর বলা চলে। ঠাকুর সপার্ষদ হলঘরে এসে বললেন, 'বাঃ, বাঃ!' সকলে তাঁকে চালিত করলেন দোতলায় ওঠার কাঠের সিঁড়ির দিকে। ঝকঝকে পালিশ। অতি মসৃণ! সবাই সাবধান। ধাপগুলি সামান্য উঁচু। ধীরে উঠছেন ঠাকুর। আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি। এখানে মায়ের আর কোনো ভূমিকা নেই, ভক্তদের সেবায় শ্রীভগবান। দোতলায় তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে ঠাকুর আরো খুশি। বেশ প্রশস্ত। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, তিনটি দিকই খোলা। পশ্চিমের দেয়াল অর্ধগোলাকার। ছাদ অনেক উঁচুতে। দক্ষিণে বেলিংঘেরা স্বল্প পরিসর ছাদ। ঠাকুর দ্রুতপদে সেই ছাদটির দিকে এগিয়ে গেলেন। চারপাশে উদ্যানের অপূর্বশোভা। অদূরে মতিঝিল। ঝিলের পশ্চিমে মতিলাল শীলের মনোরম বাগানবাড়ি। অদূরে, কিছু উত্তরে রানী কাত্যায়নীর গোপাল মন্দির। ঠাকুর বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সব দেখছেন শীতের পড়ন্ত বেলার আলোয়। 'ভারি খুশী হৈলা রায় দেখিয়া বাগান'। যাঁরা জানার তাঁরা জানেন, উদ্যানবাটীর দোতলার 'হেডকোয়ার্টারে' কোন আণবিক বোমা তৈরি হবে। ঠাকুরের এই আরোহণ দোতলায় নয়, উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে! দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ মহল থেকে খবর এল, কয়েকজন মিষ্টান্নাদি নিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছিলেন। যেই শুনলেন ঠাকুর নেই, চিকিৎসার জন্যে কাশীপুরে, তখন তাঁরা ঠাকুরের ছবির সামনেই ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। শ্রীমার মনটা কেমন হয়ে গেল! আশঙ্কা, আতঙ্ক। এতে তো ঠাকুরেরই অকল্যাণ হল। ঠাকুরকে বললেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না করে ছবিকে কেন দিলে?' পরমুহূর্তেই অভয় দান করে বললেন, 'ওগো! তোমরা কিছু ভেবো না—এর পর ঘরে ঘরে আমার পুজো হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি।' মা শুনে চলে গেলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি। তোমার খেলা! তুমি তার বাঁধছ!

দোতারা! গৃহী আর সন্ন্যাসী।'

নেতা নরেন্দ্রনাথ। তখন তাঁর সব গেছে। পিতা পরলোকে। উত্তরাধিকার, ঋণের বোঝা। জ্ঞাতি-শত্রুরা নরেন্দ্রনাথের পরিবারকে বাড়ি ছাড়া করেছে। নরেন্দ্র-জননী ভাই-বোনদের নিয়ে মাতামহী ভবনে কোনো রকমে আছেন। আদালতে মামলা চলছে। সামনেই তাঁর আইন পরীক্ষা। ইচ্ছে করলে নরেন্দ্রনাথ একজন নামকরা উকিল হতে পারতেন। একদিন এজলাসে মামলার শুনানি হচ্ছে। পিতা বিশ্বনাথের দুই বন্ধু নিমাইচন্দ্র বসু ও ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি নরেন্দ্রনাথদের পক্ষে মামলা পরিচালনার ভার নিয়েছেন। অপর পক্ষ পয়সার জোরে এক ইংরেজ ব্যারিস্টার নিয়োগ করেছেন। সেদিন ইংরেজ ব্যারিস্টার ঠিক করেছেন, নরেন্দ্রনাথকে জেরার সময় আদালতে এই প্রতিপন্ন করবেন, 'যুবক এক গুঁয়ে, রামকৃষ্ণের খেয়ালী ছোকরা—নট নরম্যাল, বাট অ্যাবনরম্যাল।' জজ সাহেব শুনছেন। ব্যারিস্টার বলছেন,'অ্যাবসলিউটলি আরোগ্যান্ট, হুইমজিক্যাল। হি ইজ এ রামকৃষ্ণ-চেলা। ক্যান ইউ ডিনাই?' নরেন্দ্রনাথ এতটুকু ঘাবড়ালেন না। সংক্ষিপ্ত একটি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "মহাশয়, আপনি 'চেলা' শব্দটির অর্থ জানেন কি?" সাহেব জানেন না। জেরা গোলমাল। সাহেব 'ল্যাজে-গোবরে।' ইংরেজ বিচারকের সপ্রশংস উক্তি, 'যুবক, তুমি একজন ভাল উকিল হবে।' ইংরেজ ব্যারিস্টার এজলাসের বাইরে এসে নরেন্দ্রনাথের করমর্দন করে বললেন, 'আমি জজ সাহেবের সঙ্গে একমত, আইন-ব্যবসায়ই তোমার উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।'

চুলোয় যাক সব, আইন আদালত, পরীক্ষা। আমরা 'রামকৃষ্ণের চেলা'। চলে আয় তোরাও। উদ্যানবাটী আমাদের সাধনক্ষেত্র। তাকিয়ে দেখ দোতলার ওই ঘরটির দিকে। খড়খড়ির জানলার পাখি ভেদ করে বেরিয়ে আসছে আলোর সমান্তরালরেখা। ওখানে মশারির ভেতর বসে আছেন ক্যানসারের ক্ষত নিয়ে মন্দিরের ভগবান নন, মানুষের ভগবান। স্বপ্নে, দক্ষিণেশ্বরের মা কালী এসেছিলেন। একপাশে তাঁর ঘাড়টি কাত। উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মা! তোমার কি হয়েছে!' তিনি বললেন, 'তোর যা হয়েছে।' মনে আছে তাঁর ওই গল্প—গার্ডসাহেবের, চৌকিদারের লণ্ঠন। সেই আলোর ফোকাসে অন্যের মুখ দেখা যায়। যাঁর আলো তাঁর মুখ দেখা যায় না। ওই সেই আলো। ওই আলোয় তিনি আমাদের মুখ দেখছেন, গৃহীদের মুখ দেখছেন, মায়ের কাছে যাঁরা আছেন সেই রমণীদের মুখ দেখছেন। চিরকালের পৃথিবীতে মানুষের তো এই তিন স্তর। এই উদ্যানবাটী সেই পৃথিবীরই একটি ল্যাবরেটারি সংস্করণ হতে চলেছে। ফেলে দে হুঁকো, গুটিযে ফেল সতরঞ্চি, পরে নে কৌপিন। সেবা আর সাধনা এক হয়ে যাক।

নীচের হলঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বড়ঘরটি সেবক-ভক্তদের বাসস্থান। নরেন্দ্রনাথ নাম রেখেছেন 'দানাদের ঘর।' নরেন্দ্রনাথের কথায় সবাই উঠে পড়লেন।

যাঁদের তন্দ্রামতো এসেছিল তাঁদের ঠেলে তোলা হল। সদলে বেরিয়ে এলেন বাগানে। শীতের গভীর রাত। ঠাণ্ডা যেন কামড়াতে আসছে। নিথর-নিস্তব্ধ চারপাশ। পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন। পায়চারি করতে করতে গভীব, গম্ভীর গলায় নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'দেহ রক্ষার সংকল্পই হয়তো করেছেন। এইবেলা যে যত সেবা আর সাধন ভজন করে নিতে পারিস করে নে।'

কয়েকদিন আগে বাগান পরিষ্কার করা হয়েছে। একপাশে শুকনো ডালপালার একটা স্তূপ। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'দে এতে আগুন ধরিয়ে।' হাতে হুঁকোটি তখনো ধরা ছিল তাঁর। কয়েক টুকরো আগুন ফেলতেই দপ্ করে সব ধরে গেল। নরেন্দ্রনাথ বললেন, 'চারপাশে সব গোল হয়ে বোস। এই আমাদেব ধুনি। সাধুরা গভীর রাতে এই রকম ধুনি জ্বালিয়ে সাধনভজন করেন। ফেল, এই আগুনে ফেলে দে সুপ্ত কামনা বাসনা। সাধুর সম্বল, তীব্র বৈরাগ্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান আর প্রেম!' সারাটা রাত কোথা দিয়ে চলে গেল।

ঠাকুরও উঠে দাঁড়ালেন শয্যা ছেড়ে। পশ্চিমের ঝলমলে রোদ প্রজাপতির মতো ঘরে ভাসছে। আজ আমি অনেক সুস্থ। আজ পয়লা জানুয়ারি! ১৮৮৬। আমাকে সাজিয়ে দে। আজ আমি বাগানে নামবো। ছুটির দিন। ভক্ত সমাগমে উদ্যান আজ প্রাণোচ্ছল। বসে আছেন সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ন্ত রোদে। অনেকে বেড়াচ্ছেন জুটি বেঁধে। দানাদের ঘরে নরেন্দ্রাদি সন্ন্যাসীসম ভক্তরা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি দূর করছেন।

বাহির উদ্যানের ভক্তরা হঠাৎ অবাক হয়ে দেখছেন, এ কী! ঠাকুর আসছেন। স্বয়ং ঠাকুর এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। অপূর্ব সাজ। সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত। মাথায় সবুজ বনাতের কান-ঢাকা টুপি। মুখে অলৌকিক, অপূর্ব এক জ্যোতিঃ। নিচের হলে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা ঠাকুরকে অনুসরণ করলেন। পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাগানে নেমে দক্ষিণদিকের ফটকের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। উদ্যান। রোদ, ছায়া, উত্তুরে বাতাস। পশ্চিমে বৃক্ষতলে বসে আছেন, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র, অতুলচন্দ্র। তাঁরা প্রণাম করতে করতে এগিয়ে এলেন। ঠাকুর তখন সরাসরি গিরিশচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন, 'গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কী দেখেছ, তুমি কী বুঝেছ?' বিশ্বাসে অটল গিরিশচন্দ্র সরাসরি এই প্রশ্নে একটুকু বিচলিত হলেন। তিনি পদপ্রান্তে নতজানু। জোড়হস্ত। ঊর্ধ্বমুখ। রুদ্রকণ্ঠে প্রখ্যাত নট-নাটকার বললেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কী আর বলতে পারি!'

ঠাকুর ঘুরে দাঁড়ালেন। উদ্ভাসিত রূপ। এ পর্যন্ত কেউ দেখেনি ওরূপ! কোথায় অসুখ! জ্যোতির্ময়। সামনে ভক্তবৃন্দ। ঠাকুর তখন বললেন, 'তোমাদের কি আর বলব আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক'। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন ভাবের ঘরে। উদ্যান ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত স্থির যেন এক কল্পতরু! হুড়োহুড়ি লেগে গেল। প্রণামের পর প্রণাম। ক্রন্দন। প্রবাদোক্ত কল্পতরুর কাছে চাইতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরুর অযাচিত

কৃপা—নাও চৈতন্য, জ্ঞান, আনন্দ। ভবযন্ত্রণা দূরের অব্যর্থ ঔষধ—শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা। যেমন তিনি নেমেছিলেন, দিন শেষে ঠিক সেই ভাবেই উঠে গেলেন ওপরে, আরো ওপরে, আর নামলেন না কোনোদিন। সাতমাস পরে উদ্যানবাটীর ফটক খুলে তিনি বেরিয়ে এলেন ত্রিধারায় সৎগৃহী হয়ে, বিশ্ব কাঁপানো বীর সন্ন্যাসী হয়ে আর পৃথিবীর মতো সহিষ্ণুমাতা হয়ে!

আর জজসাহেব বলেছিলেন, যুবক তুমি ভাল উকিল হবে। হয়েছেন। বিশ্ব আদালতেব। সব কারাগার খুলে দিয়েছেন একটি Verdict-এ পাপও নেই পুণ্য নেই আছে মানুষ। যত মানুষ তত স্বভাব! বিবেকই ধর্ম। জাগাতে চাও! চলে যাও—তিনি চিবপ্রতিষ্ঠিত—'শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাকল্পতরু'। চলে যাও জগতের জননী সারদার কাছে—তিনি সতেরও মা, অসতেরও মা।
